KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ১১ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher
Title সওগাত	Size 7"x10" 17.78x 25.40 c.m.
Vol. & Number ১০/১ ১১/২	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৪০ কার্তিক, ১৩৪১
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন	Remarks :

CD. Roll No. KLMLGK

নওগাত

মহিলা-সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এচ, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ
সম্পাদক—মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
বার্ষিক
কার্য্যালয়—১১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, (ফোন ২৪৭৮) কলিকাতা।
এই সং

প্রিয়জনের ফুল্ল মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা কার না হয় ?

"রেশমী চর্চ্চিত" "মীরা তৈল"
সুবাসিত আকুল কুন্তলদলের
নিম্নে কজ্জল-উজ্জ্বল নয়ন-পল্লব-ঘেরা,
"মীরা-স্নো" মণ্ডিত "কুসমিন" সুরভিত "মানসী"
আপনার মানসীর মধুর মুখখানি দেখিতে সাধ হয় কি ?
"মীরা"র প্রসাধন দ্রব্যগুলি সেইজন্যই দেখিতে বলি।
মীরাঃ কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র

সওগাত

মহিলা-সংখ্যা

১১শ বর্ষ — সূচীপত্র — ৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক — ১৩৪২

১।	পাথেয় (কবিতা) ...	বেগম সুফিয়া এন্, হোসেন ...	৪০১
২।	নবযুগের শিশু (প্রবন্ধ) ...	কুমারী আছিয়া মজিদ বি-এ ...	৪০৭
৩।	সমাজ্ঞী মেনেন ...	... ...	৪১২
৪।	ইতিহাসে নারীর স্থান (অনুবাদ)	মিসেস্ রে ষ্ট্রাচি ...	৪১৩
৫।	খালেদা এদিব খানম (সচিত্র প্রবন্ধ)	রাজিয়া খাতুন ...	৪২৯
৬।	ক্লান্তি (কবিতা) ...	শ্রীমতী শৈলবালা দেবী ...	৪ ৪
৭।	ইব্‌সেন-সাহিত্য ও নারী-প্রগতি (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ ...	৪২৬
৮।	সত্যিকার (গল্প) ...	বেগম সুফিয়া এন্, হোসেন ...	৪২৯
৯।	"আহুতি" (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ...	৪৪২
১০।	রুশিয়ার নারী (সচিত্র প্রবন্ধ)	... ...	৪৪৫
১১।	গান	শ্রীহাসিরাশি দেবী ...	৪৪৮
১২।	আদর্শ মানুষ (প্রবন্ধ)	কুমারী সকিনা কেরামত বি-এ, বি-এস্-সি ...	৪৫০
১৩।	সংসারের এক কোণে (কবিতা)	রাবেয়া খাতুন ...	৪৫৩
১৪।	নেপোলিয়নের প্রেমে (গল্প)	রেণুবালা মিত্র বি-এ ...	৪৫৫
১৫।	তুরস্কের নারী-জাগরণ (সচিত্র প্রবন্ধ)	... .	৪৬৪
১৬।	নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (প্রবন্ধ)	বেগম শামসুন নাহার বি-এ ...	৪৬৯
১৭।	'ফায়ার দেশ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শান্তি দেবী ...	৪৭৭
১৮।	মাতৃভূমির আশা ও ভরসা (চিত্রে)	... ...	৪৭৭
১৯।	ঝড়ের দেবতা (গল্প) ...	সলিলা ভট্টাচার্য্য ...	৪৮৫
২০।	ইস্‌লামে নারীর স্থান ...	কুমারী রওশন আখ্‌তার ...	৪৯০
২ ।	জাপানের নারী (সচিত্র প্রবন্ধ)	... ...	৮৯৩
২২।	কবি হিরণ রায় (গল্প) ...	সতী দেবী বি-এস্-সি ...	৮৯৬
২৩।	রতন টাটা নারী শিল্প-শিক্ষালয় (সচিত্র প্রবন্ধ)	... ...	৫০১
২৪।	মিশরের মহিলা-প্রগতি (সচিত্র প্রবন্ধ)	... ...	৫০৫
২৫।	কবীরের প্রেম (কবিতা) ...	শ্রীমমতা মিত্র	৫০৮
২৬।	আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার (প্রবন্ধ)	ফাতেমা খাতুন ...	৫০৯
২৭।	স্বাস্থ্য ও শক্তি (সচিত্র) ...	... ...	৫১২
২৮।	আমারে ডেকোনা বন্ধু (কবিতা)	আজিজুন্নেছা খাতুন ...	
২৯।	রূপ ও ছবি (সচিত্র) ...	... ...	
৩০।	সাময়িকী (সচিত্র) ...	... ...	

চ্যবনপ্রাশ ৩৲সের | অধ্যক্ষ মথুর বাবুর | মকরধ্বজ ৪৲ তোলা

শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা

'ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

কারখানা ও হেড্ আফিস—ঢাকা। কলিকাতা হেড্ অফিস—৫২।১, বিডন ষ্ট্রীট। কলিকাতা ব্রাঞ্চ—বড়বাজার বহুবাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, খিদিরপুর। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, মান্দারীপুর, সিরাজগঞ্জ, শ্রীহট্ট, রংপুর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, পাটুয়াটুলী, বহরমপুর, রাজসাহী, গৌহাটী, কানপুর, এলাহাবাদ, গয়া, বেনারস, কাশী চক্, গোরক্ষপুর, ভাগলপুর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, মজঃফরপুর, ঢাকা চক, নারায়ণগঞ্জ, জামসেদপুর, চৌমুহানী (নোয়াখালী), তিনসুকিয়া (ডিব্রুগড়), বেসিন (ব্রহ্মদেশ) প্রভৃতি।

সারিবাদ্যারিষ্ট—৩৲ সের।
সর্ব্ববিদ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত; ঝিঁঝিকাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—৩৲ সের।
ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲
সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।
চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২৲ টাকা
তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছেন "এছা কাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিনে কো'ই নেহি কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)"

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত হয়।"

দেশবন্ধু সি, আর, দাস—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের
সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ-তৈল।

অশোকঘৃত—স্ত্রীরোগ, শ্বেত প্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার মহৌষধ ৯৲ সের।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৶০ আনা
কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ। সকল বড় দোকানে পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটিকা—৶০ আনা
কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস।

গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স প্রাপ্ত **মৃতসঞ্জীবনী সুরা** আমাদের ভারতবর্ষের এবং বর্ম্মার সকল শাখায় পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটারগণ—শ্রীমথুরামোহন, লালমোহন ও ফণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী।
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার **শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান।**
পত্রাদি ও মণিঅর্ডার প্রভৃতি ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটারের নামে পাঠাইতে হইবে।
টেলি "শক্তি" ঢাকা।] ব্রাঞ্চ :—ভারতের সর্ব্বত্র ও ব্রহ্মদেশে [পোষ্ট বক্স নং ৬, ঢাকা।

চিকিৎসকগণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী সম্বলিত ক্যাটালগ চাহিলেই পাইবেন।

সওগাত

তন্দ্রা নেমেছে শান্ত গভীর নীমিলিত আঁখি-পাতে,
শত জনমের স্বপন ঘনায় ফুলের গন্ধ সাথে।

সওগাত

মহিলা-সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৪২

পাথেয়

বেগম সুফিয়া এন, হোসেন

জীবন-পথের শেষে নামিয়াছে ধূসর গোধূলী,
দোলায়ে শিথিল পাখা চলিয়াছে শ্রান্ত পাখীগুলি।
বঙ্কিম সুদীর্ঘ পথ বেদনার রক্ত-রাগ-লেখা
মলিন প্রদোষালোকে হেরিলাম একা, আমি একা।
বিজন পথের প্রান্তে পান্থ আর চলেনা'ক কেহ,
দু'পাশে বিটপীশ্রেণী নির্ব্বাক, নিঃশব্দ দীর্ঘ দেহ।
দিগন্তে নিভিছে আলো, ঘনাইয়া আসিতেছে রাতি,
শঙ্কায় শিহরে দেহ, কেহ নাই এ-পথের সাথী।

সহসা জাগিল কণ্ঠে গানখানি, করে গেছে দান,
অ-যাচিতে যে পথিক, চাহে নাই ফিরে প্রতিদান।
ক্ষণিক অতিথি মোর বাতায়ন ছায়া তলে এসে
দু'দণ্ড বিশ্রাম লভি' প্রতিদানে গেছে ভালোবেসে।

প্রচুর দানিয়া গেছে পূর্ণ করি জীবন আমার
নিশঙ্ক প্রাণের দীপ্তি, অকুণ্ঠিত আনন্দ সম্ভার।
সে সম্পদ হাতে নিতে লভিলাম তার পরশণ
অমৃত পরশ মনি, অকস্মাৎ ভরে ওঠে মন—
কণ্ঠ ভরি ওঠে গান ; অ-মলিন অধরের হাসি,
শূন্য এ হৃদয় মোর সুরে সুরে ভরি হ'ল বাঁশী।
প্রীতির পরমানন্দে জীবনে তাহারি স্বপ্ন গড়ি—
তাইতো সৌন্দর্য্যে আজ বিশ্ব মোর উঠিয়াছে ভরি।
স্বপ্ন তার শান্ত স্নিগ্ধ অ-নির্বান স্বর্গের আলো
নতুন করিয়া তাই পৃথিবীরে বাসিলাম ভালো।

অক্ষয় আনন্দ অর্পি, নিঃস্ব সেই পথিক-সন্ন্যাসী,
হাসিয়া করুণ হাসি, কহি গেছে আমারে আশ্বাসি—
"তোমার সুরের স্বপ্নে, ব্যথা-পুজা হোক্ সমাপন
মিথ্যা গ্লানি, কদর্য্যতা, তব স্পর্শে হোক্ আভরণ।"
তার সাথে আরো বলি ঃ—"হোক্ শেষ নয়নের জল
অধরে অমল হাসি হোক্ তব পথের সম্বল!"
সেই সে আশিষ তার লভিয়াছি নাহি আর ভয় ;
ক্ষণিক অতিথি হয়ে এসেছিল – করিয়া অক্ষয়
রাখিয়া গিয়াছে বিত্ত চিত্তে মোর অফুরন্ত দান—
অমৃত মধুর স্পর্শ, মুখে হাসি, কণ্ঠ ভরি' গান।
তবু সে যে চলে গেল তার ক্ষতি ভুলিতে না পারি,
হৃদয় দুলিয়া ওঠে নয়নে ঘনায় ব্যথা-বারি।
মিথ্যা সব, সব ভুল, বৃথা সব, নাহি প্রয়োজন,
গুমরি' গুমরি' কেঁদে অভিমানে বলে মোর মন।

নিরুদ্দেশ যাত্রী মোরে দিয়ে গেছে গানের পাথেয়
তাহারে লইয়া থাকি, বাজে সুর অশ্রুর সাথেও।

—:০:—

নবযুগের শিশু

কুমারী আছিয়া মজিদ বি-এ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নীতিশিক্ষা এবং চরিত্র-গঠন আদৌ সহজ-সাধ্য নয়—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেক বাপ-মা আছেন, যাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনো নিবেশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, আপন খেয়াল-খুশিমত তাহাদিগকে চালাইতে যাইয়া প্রায়ই অনর্থ করিয়া বসেন। কোনও সময় হয়ত যৎপরোনাস্তি কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, কখনও বা ছেলেদের হাতে একেবারে পূর্ণ স্বরাজই তুলিয়া দেন, আবার হয় ত তাহাদিগকে প্রাচীন রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণকারী হইতে শিক্ষা দেন অথবা অতি-আধুনিক হাব ভাবের প্রতিই তাহাদিগকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিয়া তুলেন। কিন্তু সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া নিখুঁতভাবে সন্তানকে গড়িয়া তোলা প্রায়ই হইয়া উঠে না।

সন্তানকে শিক্ষিত এবং যোগ্য নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে ; অর্থাৎ তাহাকে স্বাধীনভাবে চলিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

'স্বাধীন' কথা শুনিয়া অবশ্য অনেক পিতামাতাই চমকাইয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন—স্বাধীন হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষা? একেবারেই অসম্ভব, অচিন্তনীয়। আজকালকার ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার খর্ব্বতা সাধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

একথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। বাস্তবিকই আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত স্বাধীন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে ইহাদের এই স্বাধীনতা হরণ করিবারও কোন উপায় নাই। এজন্য কেবলমাত্র ছেলেরাই দোষী নহে, যুগধর্ম্মই ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমান মানুষের যাযাবর বৃত্তি, অর্থাৎ কার্য্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে পরিবার সহ দূর হইতে দূরান্তরে গমনাগমন, শহরের ফ্লাটসমূহে অসামাজিক জীবন যাপন, পল্লী-সমাজের কঠোর শাসন হইতে অব্যাহতি, উড়োজাহাজ, মোটরযান, বায়স্কোপ ও আধুনিক সাময়িক এবং সংবাদপত্রসমূহ এমন এক আবহাওয়ার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজন করিয়াছে, যেখানে জন্মগ্রহণ করিলে ছেলেমেয়েরা আপনাআপনি স্বাধীনচেতা হইয়া উঠে—সুতরাং উপায় নাই। মানব-শিশু স্বাধীন হইবেই, স্বাধীন হইবে বলিয়াই ইহাদের সেইভাবে গড়িয়া তোলা আরও বেশী প্রয়োজন। কিন্তু এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করা একান্ত কষ্টসাধ্য এবং এর জন্য ত বেশী কৃতিত্ব এবং যোগ্যতা প্রদর্শনের প্রয়োজন যাহা অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করিবার বেলায় দরকার হয় না। আমরা সমগ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে পারি নাই বলিয়াই আজকালকার ছেলেমেয়েরা অবাধ্য, মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন, নির্লজ্জ ও উদ্ধত প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোটের উপর পূর্ব্বেকার যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। সে কালে যখন ভূস্বামীদের একাধিপত্য ছিল, তখন রাজ-রাজড়া, সর্দ্দার, জমিদার-জায়গীরদারদের নিকট মাথা নোয়াইতে নোয়াইতে মানুষের মেরুদণ্ড এমন ভাঙ্গিয়া

গিয়াছিল যে, তাঁহাদের মুখের কথা স্বর্গীয় বাণীর চেয়েও বড় ভাবিয়া মানুষ শির পাতিয়া লইত আর সে যুগের বাপ-মাও ছিল যেন ছোটো-খাটো এক একটা রাজা-রাণী। সুতরাং পুত্রকন্যাগণ অনেকটা ক্রীতদাসের মতই ইঁহাদের হুকুম তামিল করিত। আর বাপ-মাও সন্তান-সন্ততিদের যন্ত্রের মত বাধ্যতা দেখিয়া প্রচুর আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করিতেন। কর্ত্তৃত্ব করিবার যুগ কিন্তু এটা নয়; এখন ছেলে যদি নিতান্ত দুরন্তও হয় তবুও তাহার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধের বোঝা চাপান সঙ্গত হইবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তার যুগে ছেলেদের স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিবারই সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের এমন শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা শৈশব হইতেই সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

সন্তান লালন-পালনের এই নূতন আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পিতামাতা এবং অভিভাবকদের রীতিমত হুঁসিয়ার হওয়া প্রয়োজন। ছেলেদিগকে বাধ্যতা অবশ্যই শিখইতে হইবে, কিন্তু এই বাধ্যতার সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি হইবে অন্য ধরণের। কেবলমাত্র বাহির হইতে কতকগুলি বিধি-নিষেধ এবং আদেশ-বাণী প্রয়োগ করিয়া সন্তান-সন্ততিদের উপর জুলুমবাজী করিবার সনাতনী রীতি বর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মন এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভরিয়া উঠিয়াছে।

জীবন-পথে চলিতে হইলে কোন না কোন প্রকার বাধ্যতার অধীন হইয়া থাকিতেই হইবে। শহরের বড় বড় পথে চলাফেরা করিবার সময় ট্রাফিক পুলিসের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনের অবাধ্য হওয়ার উপায় নাই। যখন বড় বড় ভূমিকম্প, বা মহাপ্লাবন দেশকে দেশ পয়মাল করিয়া দেয় প্রকৃতি তখন মানুষের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মানুষের এই সীমাবদ্ধতার দিক অর্থাৎ তাহাকে যে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানিয়াই চলিতে হইবে, এ শিক্ষার বীজ শৈশবকাল হইতেই শিশুর হৃদয়ে উপ্ত হওয়া দরকার। সময় সময় বাপ-মাকে এমন কঠিন হইতে হইবে যাহাতে সন্তান সমাকরূপে বুঝিতে পারে যে, অবাধ্য হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। প্রাকৃতিক বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেমন শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এবেলায়ও সেইরূপ শাস্তি-ভোগ অনিবার্য্য। বাপ মা যদি এরূপ শক্ত হয়, তাহা হইলে ছেলেরা সুপথে না আসিয়াই পারে না। এইরূপ শিক্ষায় অভ্যস্ত ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনের জন্যও তৈরী হইয়া উঠে।

ছেলেমেয়েকে চরিত্র গঠনোপযোগী শাস্তি তিরস্কার ইত্যাদি প্রয়োগের বেলায় আর এক দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষের মনের মধ্যে যে একটা বৃহত্তর সত্ত্বা আছে তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা দরকার। সন্তান যখনই কোন বিধি-নিষেধ পালন করিবে বা কোন কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে তখন যেন সে বুঝিতে পারে যে, সে নিজের মনের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে—বাহিরের কোন নির্ম্মম শক্তস্থানীয় ব্যক্তির হুকুম-মাত্রই সে তামিল করিতেছে না। শিশুমন যদি এই ভাবে শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর তাহার জন্য বিশেষ কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ বা পিতামাতার অগোচরেও তাহারা কদাচ অসৎ পথে পদক্ষেপ করিবে না। যেখানেই সে যাক, এ শিক্ষা তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে, কারণ সে রীতিমত আত্মনির্ভরশীল নিজের দায়িত্ব সে নিজেই গ্রহণ করিয়াছে; বাস্তবিকই সে স্বাধীন ভাবে চলাফেরার উপযুক্ত হইয়াছে।

শিশুশিক্ষার এই নূতন আদর্শের দ্বিতীয় বিধানটী হইতেছে যে, যে সমস্ত কাজের উপায় শিশুরা নিজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারে সে সমস্ত কাজ বাপ-মার

হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। সন্তানকে স্বাধীনচেতা করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে শৈশবেই তাহার মধ্যে চিন্তাশীলতার উন্মেষ সাধন দরকার। অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন, এ ব্যবস্থায় শিশুমনের উপর অত্যধিক চাপ দেওয়া হইবে। ব্যাপার কিন্তু তা নয়; এ-অবস্থায় মাতাপিতারই খাটুনি বেশী। ছেলেদের জন্য কোন কিছু স্থির করিয়া দেওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য, কিন্তু যাহাতে তাহারা নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই করিতে পারে এমন শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার পক্ষে রীতিমত শ্রমসাপেক্ষ।

এই অসম্ভব কথা শুনিয়া বহু পিতাই, বিশেষতঃ জননীগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবেন। প্রকৃতির বিধান অনুসারে মানব-শিশুকে দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় থাকিতে হয়। মাতাপিতার সযত্ন প্রতিপালনই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এজন্য মাতাপিতার মনেও শিশু সন্তানের উপর স্নেহের আধিক্য উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে জনক-জননীর স্নেহের এত বেশী আতিশয্য দেখা যায় যাহা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন দারুণ অন্ধকারময় করিয়া তোলে। এরূপ করিলে সন্তান দুর্ব্বল, অসহায় ত হয়ই, অনেক সময় তাহার মানসিক বিকৃতিও ঘটিয়া থাকে। বেশী আদর-যত্ন যে কতখানি মারাত্মক তাহা এই দরণের অত্যধিক স্নেহপ্রবণ জনক-জননীগণ খুব ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন যদি তাঁহারা কখনও আধুনিক মানসিক বিকৃতির চিকিৎসালয়গুলিতে পদার্পণ করিতেন। সুতরাং আদর্শ গৃহে, স্নেহ মমতার ছড়াছড়ির তত বেশী প্রয়োজন নাই, যত বেশী প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের আপন পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইবার কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদানের। আর এইভাবে সন্তানকে গড়িয়া তুলিলে সন্তানের মন বাপ-মার উপর বিরূপ হওয়া দূরে থাকুক, শ্রদ্ধাতেই ভরিয়া উঠিবে। বিপদ-আপদে, সঙ্কটসময়ে সন্তান কৃতজ্ঞ মনে এইরূপ জ্ঞানী পিতামাতার নিকটস্থও হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সন্তানকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষাদানের পক্ষে শৈশবাবস্থাই প্রকৃষ্ট সময়। প্রথমতঃ ছোট খাটো কাজে ছেলেমেয়ের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। কোনো কোনো বিষয়ে নিশ্চয়ই মাতাপিতাকেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরও মতামত জিজ্ঞাসা করা ভাল। পারিবারিক সম্মেলনে শিশুদের ছোটাধিকার বিশেষ কার্য্যকরী না হইলেও শিশুমনের উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত কার্য্যকরী। ইহাতে শিশুদের মনে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হয়, তাহাদের দায়িত্ববোধও বিকাশিত হয়। বর্ত্তমান স্বাধীনতার যুগে মাত্র এই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুই জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে।

এতদ্‌প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিজ্ঞানের তৃতীয় নীতি অর্থাৎ ঘরসংসারে ছেলেমেয়েদের স্বরাজ বা সাধারণতন্ত্র স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বর্ত্তমানে সকলের মুখেই সংস্কার, প্রগতি ইত্যাদি বুলি শুনা যায়, কিন্তু অধিকাংশ পরিবারে এখনও সেই মান্ধাতার আমলের যথেচ্ছাচার নীতিই চলিতেছে। অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, কর্ত্তৃস্থানীয় মা কিম্বা বাবা যেন ছোট-খাটো এক একজন মুসোলিনী, যিনি অঙ্গুলি হেলনে সন্তানরূপী ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে কলের মত পরিচালন করিতেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, কুড়ের সর্দ্দার বাপ-মা ছেলেমেয়েকে একেবারে বেপরোয়া স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের সংসারে কোনরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা নাই। ছেলেমেয়েরা যাহা খুশী তাহাই করিতেছে, যথায় ইচ্ছা তথায়ই গমন করিতেছে। ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরতা হইতে সম্পূর্ণ-চ্যুত হইবার জন্য দুই শ্রেণীর পরিবারই সমান অসহনীয়। প্রথম শ্রেণীর পরিবারে স্বাধীনতার নামগন্ধ নাই; দ্বিতীয় শ্রেণীতে অভাব সহযোগিতামূলক দায়িত্ব-বোধের।

সচরাচর কিন্তু এই দুই শ্রেণীর পরিবারই চোখে পড়ে। এইরূপ হইবার কারণ, এই দুই ধরণের গৃহস্থালী পরিচালন নিতান্ত সহজ-সাধ্য। ছেলেরা যাহা খুশী তাহাই করুক, যে ভাবে বর্দ্ধিত হইতে চায় সেই ভাবেই হউক—এও যেমন সোজা কাজ, ছেলেদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া একমাত্র অভিভাবকের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাদিগকে চলিতে বাধ্য করাও তেমনি সহজ। এ ভাবে ছেলে মানুষ করা মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয় না; একমাত্র "সাধারণ-তন্ত্রীয়" পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বর্ত্তমান যুগের যোগ্য নাগরিকে পরিণত হইতে পারে।

এখন "সাধারণতন্ত্রীয়" পরিবারের স্বরূপটা বুঝিয়া দেখা যাক। এই নূতন আদর্শ অনুসারে নিতান্ত ছোট শিশুকেও পারিবারিক মন্ত্রণাসভার আমন্ত্রণ করিয়া তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর বাস্তবিক পক্ষে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মত বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত দুনিয়ায় আর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না; পূর্ব্বোক্তরূপে তাহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলে মাতাপিতার প্রতি তাহাদের অনুরক্তিত বাড়িবেই, উপরন্তু, সংসারের কাজ কর্ম্মে তাহাদের বিশেষ আসক্তি জন্মিবে। মাতাপিতার প্রতি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অনুরাগের বাস্তবিকই তুলনা নাই। নিতান্ত নৃশংস যে মাতাপিতা তাহাদের উপরও অত্যাচারিত এবং নিগৃহীত শিশুর আন্তরিক টান দেখা যায়। সুতরাং সন্তান-মাত্রেই মাতাপিতার দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধিহীন পিতামাতা এমন সব মূল্যবান পদার্থকে উপেক্ষা এবং অনাদর করিয়া পারিবারিক জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশু সন্তানদেরও মস্তক চর্ব্বণ করিতেছেন।

সমর্থ মানুষমাত্রেরই ধারণা, দশের মধ্যে সেও একজন; সুতরাং সে যে কোন দল বা উপদলের অন্তর্ভুক্তই হউক না কেন, সেখানে তাহার কথা বলিবার অধিকার থাকা দরকার। শিশুর মনোভাবও ঠিক এমনি। সন্তান প্রতিপালনের এই গুপ্ত রহস্যটী যে পরিবারই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সেই পরিবারই সার্থক এবং সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় ব্যাপারেই হউক, আর দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম্মেই হউক, পারিবারিক পরামর্শ-সভায় শিশুদিগকে আহ্বান করিলে তাহার ফল ভাল না হইয়াই পারে না। মাত্র এই উপায়েই শিশুগণ উত্তরকালে যোগ্য নাগরিকে পরিণত হইতে পারে। এই ভাবে চলিবার অবসর পাইলে শিশুদের মনে স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরিবার-ভুক্ত সকলকেই সহযোগীরূপে গ্রহণ করিতে শিখিবে।

ছেলেদের এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া কিন্তু সময়-সাপেক্ষ এবং এজন্য শ্রম, ধৈর্য্য, সতর্কতা এবং সহানুভূতিরও প্রয়োজন। ছেলেকে হীনতর ভাবা উচিত নয়; তাহাকে সঙ্গীত-সহযোগী রূপে কল্পনা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পিতামাতা যদি এই কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, তবেই সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতাও পুরস্কৃত হইবেন; কারণ, সংসারে কি এমন কোন মাতাপিতা আছেন যিনি সন্তানকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া না উঠেন?

ছেলেদের স্বাধীনতা-শিক্ষা সুসম্পন্ন করিতে হইলে শৈশব হইতেই তাহাদিগকে এমন সব কাজে অভ্যস্ত করা দরকার যাহাতে তাহাদের সৃজন-প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। আজকালকার ঘর-সংসারের যেরূপ অবস্থা, গৃহে যেরূপ আরাম-প্রদ আসবাব পত্রের আধিক্য তাহাতে ছেলেদের নিষ্কর্ম্মা এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। ছেলেদের মনের মধ্যেও যে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে এ-কথা ভুলক্রমেও কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না।

বর্ত্তমান যুগের কতিপয় শিক্ষা-বিজ্ঞানবিৎ এ-সত্যটা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ছেলেদের আপন হাতে কাজ করিবার অধিকার দিলে তাহাদের এত বেশী মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হয়, যেমন আর কিছুতেই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক গৃহেই শিশু-শিক্ষার এই অতিআধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এজন্য অভিভাবকদের পক্ষে বিশেষ কোন কষ্ট করিবারও দরকার নাই। থালা বাসন পরিষ্কার করা, খেলিবার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, ছোট-খাটো বাগান তৈরী করা, সাঁতার শিক্ষা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মেই শিশুদের মন ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হইয়া উঠিবে। ছেলেদের মনে যখনই কোন কিছু করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, ছেলেদের খেয়াল বলিয়া লগুড় হস্তে তাহাদিগকে নিবৃত্ত না করিয়া তখনই তাহাদিগকে উহা সম্পন্ন করিবার অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে বালক-বালিকাদিগকে ক্ষেত খামারে কাজ করিতে দিলে, এবং নৌকা চালান, বনে জঙ্গলে কাঠ কাটা ইত্যাদি বাইরের কাজে অভ্যস্ত করিতে পারিলে এত বেশী ফল ফলে যে, বহুবর্ষব্যাপী স্কুল-কলেজে অধ্যয়ণ, বা ভাল ভাল উপদেশমূলক বক্তৃতাদির দ্বারাও তাহা সম্ভবপর নয়।

মোটের উপর, বাধ্যতামূলক শিক্ষাদীক্ষার পরি-বর্ত্তে ছেলেরা যাহাতে অন্তরের অনুপ্রেরণায় স্বেচ্ছায় সংযত এবং সুন্দর জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জোর করিয়া কতকগুলি কেতাব বা কাজের বোঝা চাপাইয়া না দিয়া প্রথম হইতেই বুঝিতে হইবে শিশুর মনের প্রবৃত্তি কোন দিকে। বিদ্যালয়ে শিশু মনের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আবিষ্কারের প্রকৃত স্থান নয়। গৃহই শিশুমন বিকাশের প্রকৃষ্ট লীলা নিকেতন। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহিত ছেলেমেয়ে-দের সম্বন্ধ আর কত বেশী নিবিড় হইতে পারে? মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজনের সহিতই ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং-সত্যিকার পরিচয়; সুতরাং তাঁহারা শিশু মনের যত বেশী খোঁজ খবর রাখিতে পারেন, বাহিরের কাহারও পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নয়। ছেলেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিরূপণের পর যদি তাহাদের তদনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে আর কোন ছেলেই অপদার্থ বিবেচিত হইবে না. সকলেই আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কাজ করিবার অধিকার পাইয়া নিজেরাও ধন্য হইবে এবং সমাজও হইয়া উঠিবে সার্থক এবং সুন্দর!

সম্রাজ্ঞী মেনেন

সম্রাজ্ঞী মেনেন আবিসিনিয়ার বীর-সম্রাট হেইল সেলাসীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। স্বামীর মতই তিনি স্বদেশ-বৎসলা। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিষ্ট ইতালি একান্ত গায়ের জোরে আজ আবিসিনিয়ায় ধ্বংস-লীলা প্রকট করিয়াছে। দেশ এবং জাতির এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি স্বামীর মতই নিজের জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রেও ইনি উপস্থিত হইবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সম্রাজ্ঞী মেনেন শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব প্রাণশক্তির অধিকারিণী। দেশের নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে প্রেরণা তিনি আনয়ন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। দলে দলে নারী স্বেচ্ছা-সেবিকা সম্রাজ্ঞীর পতাকামূলে সমবেত হইতেছে।

ইতালি-আবিসিনিয়া সংগ্রামের প্রাক্কালে ইনি নিখিল জগতের নারী সমাজের নিকট যে আবেদন-লিপি প্রচার করেন তদ্দ্বারা অতি-সহসা এই তথাকথিত অনগ্রসর হাব্‌সী মহিলা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্রাজ্ঞী মেনেনের রাষ্ট্র-প্রতিভাও অনন্য-সাধারণ আবিসিনায়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সঙ্কটে ইনি সম্রাট হেইল সেলাসীর প্রধান উপদেষ্টা এবং অনু-প্রেরণা প্রদান-কারিণী। যুদ্ধ-পরিচালনার্থ সম্রাটকে প্রায়ই রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করিতে হয়। এ সময় সম্রাজ্ঞী মেনেনই রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। পার্শ্বে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য-নিরতা সম্রাজ্ঞীর ছবি দেওয়া হইল।

ইতিহাসে নারীর স্থান

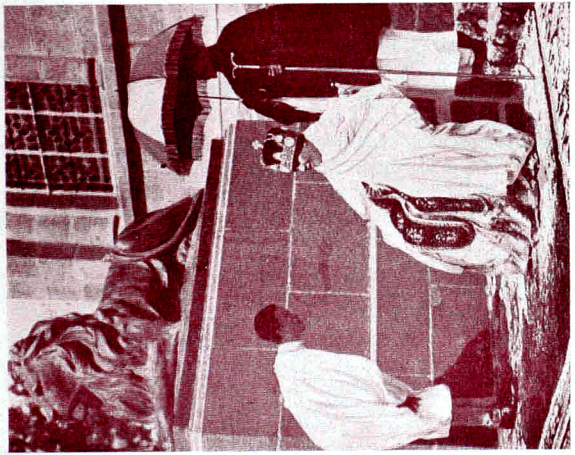

(বিলাতের বিখ্যাত লেখিকা মিসেস্ রে ষ্ট্রাচীর ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে)

ইতিহাসে নারী চিরদিনই প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। মানব জাতির অর্দ্ধেকাংশ নারী, নারী-প্রভাববর্জ্জিত ইতিহাসের কল্পনা করাই যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুষ্টিমেয় দুই চারি জন রাজ্ঞী, অপূর্ব্ব সুন্দরী বা সন্ন্যাসিনীদের বিবরণীই ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, সাধারণ নারীজাতি যেন বিস্মৃতির অতলস্পর্শী গর্ভেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

যুগে যুগে অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, চিন্তারাজ্যে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, রাষ্ট্র কোন পথে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সামরিক প্রথারই বা কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, শিক্ষা, কৃষ্টি ইত্যাদিরই বা কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইতিহাসে সমস্ত সন্ধানই পাওয়া যায়। কিন্তু ঘর-সংসারের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ মেয়েদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন যেরূপ হইয়াছে তাহা সঠিক কোথাও মিলিবার সম্ভাবনা নাই। কষ্ট কল্পনা করিয়া সময় সময় দুই চারিটী কথার অবতারণা করা হয় মাত্র।

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা, পুরুষই সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইয়াছে; আর মেয়েরা চিরদিন অনগ্রসরই রহিয়াছে। পুরুষদের ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততির ভার গ্রহণ করাই নারীত্বের চরম আদর্শ। ঐতিহাসিকগণ এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই নারীকে কোন দিনই আমল দেন নাই। সেইজন্য নারী সম্পর্কে তাঁহাদের লেখনী আদৌ মুখর হইবার অবসর পায় নাই। নারীদের প্রতি এইরূপ অবিচার কি অন্যায় নহে?

আদিম যুগের অবস্থা কিন্তু এইরূপ ছিল না। মানুষ যখন পর্ব্বতের গুহায় বা বৃক্ষ-স্কন্ধে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিত তখন নারী-সমস্যা আদৌ দেখা দেয় নাই। নর এবং নারী উভয়েই তখন সমান অধিকার ভোগ করিত। নর এবং নারীর ইতিহাসও তখন একই ধরণের ছিল।

এই সাম্যের যুগ কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। মানুষের জীবনে নূতন নূতন সমস্যার আবির্ভূত হইয়া উহাকে ক্রমশঃ জটিল করিয়া ফেলে। নর এবং নারীর জীবনযাত্রার ধারা ক্রমেই দুইটী পৃথক প্রবাহে চলিতে আরম্ভ করে; এই ভিন্ন পথে যাত্রা সুরু হয় যুদ্ধ বিগ্রহ, চাষ-বাস এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মানুষ যখন সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করে তখন হইতে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তথাকথিত সামাজিক জীবনের প্রথম উন্মেষের অশুভ ক্ষণে এবং প্রথম ধর্ম্ম-চর্চ্চার অনুপ্রেরণার দিনই নারীকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

তদনন্তর, পরিবর্ত্তনশীল জগতে নরনারী একত্র পাশাপাশি জীবন যাপন করিলেও উভয়ের ইতিহাস ঠিক একই রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে বলা যায় না। ক্রমে সমাজে নারীর পৃথক আইনগত মর্য্যাদার সৃষ্টি হইয়াছে—নারী যেন আর একটা নূতন জগতের প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে।

নারী এবং পুরুষের পৃথক পৃথক দুইটী ইতিহাসের তুলনামূলক বিচার করা যদি সম্ভবপর হইত তাহা হইলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিত।

নর-নারীর মধ্যে সামাজিক পার্থক্য যাহা সুদূর অতীত হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, চারিটী কারণবশতঃ নর-

নারীর মধ্যে ভেদের স্থ-উচ্চ প্রাচীর ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। যৌন পার্থক্য, সামরিকতা, নূতন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সুপ্ত অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তাধারা এই কয়টী মিলিত হইয়া নারীর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে।

এই কারণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ যৌনগত পার্থক্যটীই নারীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নারীর দৈহিক শক্তি কম, বিশেষতঃ সে যে সন্তানের গর্ভধারিণী এইজন্য নরনারীর মধ্যে শ্রম-বিভাগ করিয়া কতকগুলি কাজ কেবলমাত্র নারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আর নারীর দৈহিক শক্তি কম বলিয়াও তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক কাজের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পুরুষ নারীকে হীনতরই ভাবিয়া আসিয়াছে এবং এখনও মানুষের মন হইতে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপ দুরীভূত হয় নাই। সমগ্র মানব জাতির অর্দ্ধেককে এইরূপ হীন ভাবা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

মানুষের অন্তর্নিহিত যুদ্ধ-হাঙ্গামা করিবার প্রবৃত্তিও নারীকে পরাধীন করিবার জন্য অনেকখানি দায়ী। পুরুষের রণোন্মাদনা দুই দিক হইতে নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রথমতঃ বীরত্বের যত বেশী আধিক্য হইয়াছে পুরুষ নারীকে তত বেশী হীন, অপদার্থ এবং কাপুরুষ ভাবিয়াছে। উপরন্তু যুদ্ধ-হাঙ্গামার ফলে নারীর আরও বহু দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ-বিজেতাগণ নারীকে লুণ্ঠনযোগ্য দ্রব্যের সামিল ধরিয়া লইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধ হাঙ্গামার যত বেশী বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছে নারীর অবস্থা ততই হীন হইতে হীনতর হইয়াছে।

যুদ্ধ হাঙ্গামা অর্থাৎ সামরিকতা এক পক্ষে নারীর চরম দুর্দ্দশার কারণ হইলেও এই পরম অশুভ হইতে আবার মঙ্গলও আবির্ভূত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিগত মহাযুদ্ধের পর বহু দেশে অপ্রত্যাশিত রূপে নারী-জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ অবশ্যই আছে। বিগত মহাযুদ্ধ কেবলমাত্র হাল-হাতিয়ার বা শারীরিক শক্তি-বিক্রমের যুদ্ধমাত্র ছিল না, ইহা ছিল প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক শক্তির যুঝাযুঝি। যুদ্ধের সময়ে অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ নারীর শৃঙ্খল আপনা আপনি খসিয়া যায়। নারীর পরিশ্রম এবং নারীর সহযোগিতা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও যুদ্ধ চালাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নারীকে অন্তঃপুরে বসিয়া কাল হরণ করিতে হয় নাই। লড়াইয়ের সময় ইউরোপে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা এবং দোকানগুলি নারীকেই পরিচালন করিতে হইয়াছে। কারণ অধিকাংশ সমর্থ পুরুষই তখন যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তুর্কীর মুসলিম মেয়েরা পর্য্যন্ত অন্তঃপুরের বাহিরে, এমন কি, রণক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

মোটের উপর খাঁটী অর্থনৈতিক কারণবশতাই নারীর পরাধীনতার শিকল ক্রমেই টুটিয়া আসিতেছে। শুধু এই মাত্রই নয়; উপার্জ্জনক্ষম নারীর দল আজ-কাল অনেক দেশেই বিভীষিকা উপস্থিত করিয়াছে। পুরুষের চেয়ে নারীর দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ কম, নারী অল্প মজুরিতেই সন্তুষ্ট। কল-কারখানায়, আফিসে, দোকান ঘরে, নারী মজুর, নারী কেরাণী এবং নারী বিক্রেতা নিয়োগ করার জন্য পুরুষদের বেকার সমস্যা আরও সঙ্গীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

নারীর স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চতুর্থ কারণটী খুঁজিতে হইবে মানুষের মনোরাজ্যে। নীতি-শাস্ত্র, আইনের কেতাব, ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদিকে নারী-সমস্যা লইয়া অত্যন্ত বিব্রত দেখা যায়। নারী দার্শনিক, নারী আইনজ্ঞ বা নারী ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারের সংখ্যা খুবই অল্প, তবুও নারী-সমস্যা যে কেন এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হইল তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পারিবারিক বা সমাজ জীবনে নারীর কোন স্থান নাই—এখানে তাহারা ক্রীতদাসীর সামিল কিন্তু ভাবের রাজ্যে তাহারিগকে একরূপ সপ্তম স্বর্গেই উন্নীত করা হইয়াছে। শাস্ত্রসমূহ নারীর প্রতি সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় ভরপুর। দেবতাদের চেয়ে দেবীর সংখ্যাই যেন বেশী দেখা যায়। নারীকে দেবীরূপে কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার জন্য অসংখ্য নিয়ম-কানুনও রচিত হইয়াছে। সমাজের ধারণা, পুরুষ জাহান্নামে যাক না কেন, নারীকে ধর্ম্মশীলা হইতে হইবে। যুগ যুগ হইতে নারী নিষ্ক্রিয় ভাবে সমাজের এই ব্যবস্থা মানিয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইহা কি নারীর প্রকৃতিগত, না ইহা জোর করিয়া তাহার উপর আরোপ করা হইয়াছে? ধর্ম্মীয় প্রতিক্রিয়া এবং প্রচারকার্য্যের ফলস্বরূপ ইহা দাঁড়াইতে পারে, অথবা নারী নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াই এই প্রথা অবলম্বন করিয়া ছিল।

আর নারী যে চিরদিনই সতী-সাধ্বী ছিল এমনও নয়। অতীতে দলবদ্ধ বিবাহ প্রথার যুগে দলভুক্ত প্রত্যেক নারীই ছিল প্রত্যেক পুরুষের স্ত্রী আবার প্রত্যেক পুরুষই ছিল প্রত্যেক নারীর স্বামী। দল-বদ্ধ বিবাহপ্রথা লুপ্ত হওয়ার পরও পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। নারী কি ইচ্ছা করিয়াই বহু পুরুষের সাহচর্য্য-লিপ্সায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবল একজন মাত্র পুরুষের ভজনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে? এই স্থলে আরও জিজ্ঞাস্য, এক একটী জাতির এক এক রকম প্রথা গ্রহণ করারই বা কারণ কি?

এতদ্‌প্রসঙ্গে মাতৃতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। সমাজের এমন এক অবস্থা ছিল যখন পিতা নির্ণয় করা একরূপ দুঃসাধ্যই বিবেচিত হইত। সন্তান-সন্ততি মাতার নামেই পরিচিত হইত এবং বংশও নির্দ্ধারিত হইত মাতৃকুল অনুসারে। তবে মাতৃতন্ত্রের আমলে নারী যে পরিবার বা গোষ্ঠীর কর্ত্তৃস্থানীয় ছিল এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাতৃতন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত দুই ধারায় বিকশিত হইতে আরম্ভ করে; এক দিকের পরিণতি দাঁড়ায় নারীর দাসত্ব, অপর দিকে নারী আংশিক স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া চলিতে সমর্থ হয়।

অতীতে নারী কেবলমাত্র অবিচারই যে ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা নহে; নারীর প্রতি দয়া কেবলমাত্র মুসলিম বা খৃষ্টীয় সভ্যতারই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও নারী এমন অবস্থায় ছিল যাহা বর্ত্তমান সভ্যতাকে হার মানাইয়া দেয়। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেসো-পোটেমিয়ায় নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিয়াছিল। ঐ দেশের নারী ব্যবসা বাণিজ্য পরি-চালন করিয়াছে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চ আসনের মর্য্যাদা পুরুষের সমান অটুট রাখিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চাও ঠিক পুরুষদের সমান ছিল; ধর্ম্মীয় কাজেও নরনারীর সমান অধিকার ছিল। মাতাই ছিল সন্তানদের প্রধান অভিভাবিকা; আর মা-বাপের মৃত্যুর পর মেয়েরা ছেলেদের সমান সম্পত্তির অংশ ভোগ করিত। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে উভয়েরই সমান অধিকার ছিল। পুরুষ কিম্বা নারী যে কেহ ইচ্ছা করিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারিত এবং সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার সময় বিষয় সম্পত্তি সমান দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যাইত। তবে স্ত্রী যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিত, এবং স্বামী যদি আদালতে প্রমাণ করিতে পারিত যে, 'স্ত্রী কলহ পরায়ণ এবং গৃহস্থালীতে অমনোযোগী' তাহা হইলে স্ত্রীকে শাস্তি ভোগ করিতে হইত। সে-কালে জলে ডোবান এমন কোন সাংঘাতিক শাস্তি বলিয়াই গণ্য হইত না। ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত পুরুষ এবং নারী

সকলকেই এই শাস্তি গ্রহণ করিতে হইত। আরও কতকগুলি অপরাধে এই দণ্ড প্রদান করা হইত।

প্রাচীন মিসরেও নারী বহু সুখ সুবিধার অধিকারিণী ছিল। নারীই ছিল এই দেশে ভূমির এক মাত্র অধিস্বামিনী এবং উত্তরাধিকারিণী। সেইজন্য প্রাচীন মিসরে মেয়েরা বৃদ্ধ বাপ-মাকে প্রতিপালন করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল। তবে মেসোপোটেমিয়ার মেয়েদের মত এদেশের মেয়েরা এত বেশী অধিকার পায় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাষ্ট্রের কাজে এদের অধিকার কম ছিল। তবে রাজবংশের মেয়েরা সকল প্রকার অধিকারই ভোগ করিতেন।

প্রাচীন গ্রীসে কিন্তু নারী সাংঘাতিক রূপে নির্য্যাতিত হইয়াছে। গ্রীকদের নিকট নারী ছিল যেন সামান্য বিলাসের সামগ্রী। পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা অনেক সময় নিরীহ শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া পাহাড়ের উপর ফেলিয়া আসিত কিম্বা জনাকীর্ণ শহরের রাজপথে নিক্ষেপ করিত। এত বড় নৃশংসতার বিরুদ্ধে মায়ের সামান্য প্রতিবাদ করারও অধিকার ছিল না। রোম সাম্রাজ্যে মেয়েদের অবস্থা গ্রীক মেয়েদের চেয়ে সামান্য কিছু উন্নততর হইলেও সকল বিষয়ে পুরুষদেরই আধিপত্য ছিল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আমলে নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করে। খৃষ্টান সাধু মোহান্তগণের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, তাহারা নারীকে নরকের দ্বার রূপে কল্পনা করে এবং নারীকে সয়তানী, পিশাচিনী-রূপে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে সমাজে নিতান্ত হেয় এবং অবজ্ঞাত করিয়া ছাড়ে। ভারতের আর্য্য হিন্দুগণও নারীত্বের অবমাননা করিতে কসুর করে নাই। মনু, পরাশর প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নারীকে সাক্ষাৎ কলুষরূপিণী বলিয়া অভিহিত করেন। পুরুষকে বিমোহিত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনই নাকি নারীর একমাত্র কার্য্য; সেইজন্য মুনি-ঋষিরা বিশ্ব ব্যাপিদিগকে নারী হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে দেশের শাস্ত্র নারীকে এইভাবে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে সে দেশে বাল্য বিবাহ, বৈধব্য ব্রত, সতীদাহ, অবরোধ প্রথার মত অনর্থকর রীতিনীতি-সমূহ যে গড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হিন্দু ধর্ম্মের শাখা-স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মেও নারীত্বের কদর বিশেষ দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রথমতঃ নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া ইহা ঠিক সনাতনী ধর্ম্মমতেরই মত নারী জাতির বিরুদ্ধে সমান অনুদার এবং সমান অত্যাচার অবিচারের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে নারীর অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। চীনারা এত বেশী হুঁসিয়ার যে আঁতুড় ঘরেই শিশু মেয়ের পায়ে লোহার জুতা পরাইয়া দিয়া একেবারে তাহাকে এমন পঙ্গু করিয়া রাখিল যে গৃহত্যাগ করিয়া আর তাহারা বাহিরে যাইতে পারিবে না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, চীন জাতি মেয়েদের কিরূপ চোখে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। আজকাল অবশ্য এই কুপ্রথা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে।

প্রাচ্য জগতে নারীত্বের যে কতখানি অবমাননা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বুঝা যায় সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা হইতে। নারী সাহচর্য্য করিলে নাকি ভগবৎ প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির কোনই উপায় নাই। এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিয়া তাহারা নারী বর্জ্জন করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। মেয়েদের ভয়ে সমাজ-সংসার ছাড়িয়া দিয়া অনেকে অরণ্যে, পর্ব্বত গুহায় পর্য্যন্ত আশ্রয় লইয়াছে। এখনও এদেশে এমন সব মঠ বা মন্দির আছে যেখানে মোহান্তদিগকে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। প্রাচীন যুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকদের পক্ষেও বিবাহ

নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচ্যের পরম সৌভাগ্য যে, ইসলাম এইরূপ অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ধর্ম্ম জীবনে তথা পারিবারিক জীবনে ইসলাম নারীত্বের গৌরব এতটুকুও ম্লান হইতে দেয় নাই।

Chivalry অর্থাৎ বীরত্বের যুগে অবশ্য নারীর মর্য্যাদা সামান্য কিছু বর্দ্ধিত হয়। যোদ্ধাগণ বীরত্ব-গৌরব লাভের জন্য দূরদেশে প্রয়াণ করিতেন আর ঘর-সংসারের ভার থাকিত স্ত্রীর উপর। অনেক সময় সুন্দরী কোন রমণীর প্রেম-কটাক্ষ লাভের জন্য বীরপুরুষগণ বহু বর্ষ-ব্যাপী বীরত্ব-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। আপদে-বিপদে নারীকে রক্ষা করাও বীরপুরুষদের স্বধর্ম্ম ছিল। সাহিত্যও এই সময় নারী-চর্চ্চায় তথা নারীর গুণ-গানে, স্তব-আরাধনায় ভরপুর হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে স্বামীরা উঠিতে বসিতে স্ত্রীদিগকে মারপিট করি। স্ত্রীদের হস্ত চুম্বন করিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ সমস্ত দুরীভূত হইয়া যায়। মেয়েরা পুরুষদের সামান্য সামান্য নেক্ নজর পাইলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নারীর অবস্থা শোচনীয়ই থাকে। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় জগতের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নাই। পশ্চিমের মেয়েরা একটু আলো বাতাস বেশী ভোগ করিতে পাইত বা এখনও পাইতেছে, এইমাত্র যা পার্থক্য।

মেয়েদের অবস্থা এইরূপ হীন হইলেও ইতিহাস গঠনে ইহারা কম সহায়তা করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের জন্ম হয় প্রকৃতপক্ষে ফরাসী অভিজাত মহিলাদের প্রকোষ্ঠে। বড় বড় সাহিত্যিক এবং রাজনীতিকগণ এই সমস্ত মজলিসে সমবেত হইয়া নূতন নূতন তথ্যসমূহ আলোচনা করিতেন। ভল্‌টেয়ার, রুসো, ডিডেরট, গিবন প্রভৃতির সাহিত্য-প্রতিভা মেয়েদের মজলিসেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ফরাসী মহিলারা এক হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও, তাঁহারা যে বিপ্লবের বিশেষ কোন ফলভোগ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা ফরাসী বিপ্লবের এই তিনটী মূলমন্ত্র হইলেও ফরাসী নারীদের ভাগ্যে উহার ছিটে-ফোঁটাও মিলে নাই। বিপ্লবের সময় মেয়েরা পুরুষদের সমান আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে, বহু ফরাসী নারীকে গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে তবুও তাহাদের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয় নাই; দুঃখের বিষয়, এই বিংশতি শতাব্দীতেও ফরাসী নারীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে।

ফরাসী বিপ্লবের ফলভোগ নারীরা করুক আর নাই-ই করুক ইহা সত্য যে, ফরাসী বিপ্লব হইতেই নারী আন্দোলন সুরু হইয়াছে। কার্য্যতঃ নারীদের পক্ষে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইলেও থিয়োরী হিসাবে নারীদের ঐ সমস্ত অধিকার মানিয়া লওয়া হয়। চিন্তারাজ্যের এই সমস্ত অধিকারে নারীর এমন কিছুই সুবিধা হয় নাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নারীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন দেখা যায়। পুরুষের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া নারীর অন্য কোন অস্তিত্বই ছিল না।

পণ্ডিত-স্থানীয় ব্যক্তিগণ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছেন, বিরাট বিরাট গ্রন্থও তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নারীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা সামান্য চিন্তাশীলতার পরিচয়ও প্রদান করেন নাই। মেয়েরা নিজে যতদিন পর্য্যন্ত নিজেদের জন্য চিন্তা করিতে অগ্রসর হয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত এ পথে কেহই পদক্ষেপ করেন নাই। অবলা নারীদের আবার অর্থনৈতিক সমস্যা কি থাকিতে পারে? কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে, নারী কেবলমাত্র নারীই নয়, নারী মানুষও বটে। নারীকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারে নিম্ন আসনে বসাইয়া রাখিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জগতে নারী জাতি নিতান্ত হীন দশায় পতিত হয়, আবার এই সময়ে নারীর উন্নতি বিধানের জন্য আন্দোলনও উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, যে পর্য্যন্ত নারী নিজে আন্দোলন অগ্রসর না হইয়াছে সে পর্য্যন্ত কোন কাজই আরব্ধ হয় নাই। নারী প্রগতির ধারা মন্থর গতিতেই অগ্রসর হইয়াছে এবং এইরূপ হইবার কারণও আছে। শত সহস্র বৎসরের অন্যায় অবিচারসমূহ কি রাতারাতি বিদূরিত হইবে?

বর্ত্তমানে অবশ্যই নারী জাতির জীবনে নূতন যুগ আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু নারীর পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও অনেক দেরী। বহু দেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ সমস্ত অগ্রগামী দেশ এখনও প্রাচীন সুমেরিয়ার আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই। নারীর অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা এখনও স্বপ্নের বিষয়। আর্থিক বিষয়ে নারী স্বাধীন হইলে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সে সম্পর্কে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা এবং মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ অবস্থা হইতে সুখেরই হইবে; হয় ত পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ-শান্তিই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু নারী স্বাধীনতার সমর্থকগণ পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য আনয়নের যে কল্পনা করিতেছেন তাহা হয় ত না-ও হইতে পারে; আবার নারীকে দাসী করিয়া রাখাই যাহাদের মতলব তাহাদের মতানুযায়ী সর্ব্বনাশকর প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত না-ও হইতে পারে। তবে ইহা সত্য যে, মানব জাতির অর্দ্ধেকের নিকট ইহা উপভোগ্যই হইবে।

পুরুষ জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির উপর নারীর আর্থিক স্বাধীনতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিলে মনে হয়, মোটের উপর অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে অমঙ্গলকর কিছুতেই হইবে না নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দুনিয়া কোন দিনই অগ্রগামী হইতে পারে নাই। স্বাধীনতা-প্রাপ্ত আধুনিক নারী পুরুষদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করিয়া চলিবে এবং আশা করা যায়; উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় জগতের অবস্থা উন্নততরই হইবে।

———

খালেদা এদিব খানম

রাজিয়া খাতুন

মহাসমরের অবসানে তুরস্কের জাতীয় জীবনে এক ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। বৃটিশ সৈন্য তখন কন্‌ষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া লইয়াছে। বৃটেনের প্ররোচনায় উদ্দীপিত নগণ্য রাষ্ট্রশক্তি গ্রীস এশিয়া মাইনর কুক্ষিগত করিয়া লইবার জন্য নিম্নজ্জ সমরাভিযানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যে কয়জন অকুতোভয় দেশ-প্রেমিক নরনারী তুরস্ককে রাষ্ট্রীয় অধীনতার গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া পরাজিত, অবসাদগ্রস্ত তুর্কী জাতিকে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন খালেদা এদিব খানম তাঁহাদেরি অন্যতম। "তুর্কী জাতির জননী রূপে" পরিচিতা এই মহীয়সী মহিলার নাম তুরস্কের ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান রহিবে।

জন্ম ও বাল্যকাল

খালেদা এদিব খানম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বস্‌ফোরাস প্রণালীর তীরবর্ত্তী বেশিক্‌তাশ্‌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা এদিব বে সুলতান আবদুল হামিদের সেক্রেটারি ছিলেন। শৈশবেই খালেদা মাতৃহারা হন এবং পিতামহীর উপরেই বিশেষ রূপে তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পিত হয়। এই স্নেহময়ী মহিলা খালেদার জীবন এবং চরিত্রের উপর যে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এ-কথা খালেদা তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মাতৃহারা মেয়েটীর উপর এদিব বেরও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইংরাজ জাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সন্তান লালন-পালনে ইংরাজ জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইংরাজদের প্রথাতেই তিনি খালেদাকে লালন-পালন করেন এবং তাঁহার এ-চেষ্টা যে বিশেষ রূপে ফলবতী হইয়াছে, খালেদার পরবর্ত্তী জীবন তাহার জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান।

স্কুল-কলেজে খালেদা

মেয়ের শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ বশতঃ এদিব বে খালেদার ছয় বৎসর বয়সেই 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। বাল্য-শিক্ষকদের মধ্যে আহ্‌মদ আগার নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি বালিকা খালেদাকে তুর্কী ভাষার গল্প পড়িয়া শুনাইতেন। এইভাবে তুর্কী সাহিত্যের একটা নূতন দিকের সহিত খালেদার পরিচয় লাভ হয়। ভবিষ্যতের সাহিত্য সাধনায় ছেলেবেলার এই শিক্ষা অনেকখানি সহায়তা করে।

১৮৯৪ সনে খালেদা মার্কিণ মহিলা কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। বয়সে কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ। কলেজে বেশীদিন থাকা খালেদার হইয়া উঠিল না। মাত্র এক বৎসর কাল বিদ্যাভ্যাসের পর সুলতানের হুকুমে তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ সুলতান তুর্কী বালক-বালিকাদের বিদেশী স্কুল-কলেজে পড়া পছন্দ করিতেন না। ইংরাজী ভাষা শিখিতে খালেদাকে আরও অনেক বেগ পাইতে হয়, কারণ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা তদানীন্তন প্রবীণ তুর্কীদের চক্ষুশূল ছিল। খালেদা কিন্তু কিছুতেই দমিলেন না। শিক্ষয়িত্রীর পর শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তিনি ক্রমাগত

খালেদা এদিব খানম

ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীদের সকলেই ছিলেন বিদেশী মহিলা। ইঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহার মনের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন। এই শিক্ষয়িত্রীর প্ররোচনায় তিনি "The Mother" অর্থাৎ 'মাতা' নামক ইংরাজী পুস্তকের তুর্কী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি লিখিয়া খালেদা সুলতান

যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী মহিলা

আবদুল হামিদের পক্ষ হইতে সম্মানসূচক পারিতোষিক লাভ করেন। ইংরাজী ছাড়া তিনি গৃহশিক্ষকের সাহায্যে আরবী, ফরাসী এবং তুর্কী ভাষাতেও বুৎপত্তি অর্জ্জন করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে খালেদা পুনরায় কলেজে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি পান। এই সময়ে তিনি কলেজসংলগ্ন ছাত্রী-নিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মার্কিন কলেজের স্বাধীন আবহাওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার ক্রমেই উন্মেষ হইতে থাকে এবং এই মুক্ত চিন্তাধারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করে। কুসংস্কারসমূহ একে একে সমস্তই দূরীভূত হইয়া তাঁহাকে পরবর্ত্তী গৌরবময় জীবনের জন্য বিশেষ রূপে তৈরী করিয়া তুলে।

কলেজে খালেদা অন্যান্য ছাত্রীদের শীর্ষস্থানীয়া হইলেও অঙ্কে তাঁহার মোটেই রুচি ছিল না। এই জন্য তাঁহার পিতা সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ সালেহ্ জকী বেকে খালেদার গণিত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া খালেদা গণিতেও পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। ১৯০১ সনে ইনি এই মার্কিন কলেজ হইতে গ্র্যাজুয়েট রূপে বহির্গত হন।

বিবাহিত ও সাংসারিক জীবন

১৯০১ সনে কলেজ পরিত্যাগের পর ভূতপূর্ব্ব গণিত শিক্ষক সালেহ্ জকী বের সহিত খালেদা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। গৃহিণীর মতই এবার তিনি আবদ্ধা হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সেবা এবং সাংসারিক কাজে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাই বলিয়া যে তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা বন্ধ হইল তাহা নয়। জ্ঞানের বর্ত্তিকা একবার যাহার মধ্যে প্রজ্বলিত হয়, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তা আর নির্ব্বাপিত হয় না। ঘর-সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও স্বামীর গণিত এবং দার্শনিক গবেষণায় তিনি বিশেষ রূপে সাহায্য করিতেন আর অবসর সময়ে ফরাসী সাহিত্যে নিমজ্জিত থাকিতেন। ফরাসী কথাসাহিত্যিক জোলা (Zola) তাঁহার মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

বিবাহিত জীবন কিন্তু খালেদার বিশেষ সুখের হয় নাই। ১৯১০ সনে তাঁহার স্বামী পুনরায় দারপরিগ্রহ করায় খালেদা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করেন এবং ১৯১৭ সনে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আদনানের সহিত পুনরায় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবন

খালেদার লেখিকা-জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয় সুবিখ্যাত "তানীন্" পত্রিকায়। এই পত্রিকায় সালেহ্ জকী বে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন। সাহিত্য-অধ্যাদের ভার পড়ে খালেদার উপর। তুর্কীদের ঐক্য-আন্দোলনে খালেদা ছিলেন অগ্রদূতী। 'তানীন্' পত্রিকায় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া প্রাচীনপন্থীরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। এমন কি বেনামী পত্রাদিতে তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয়ও দেখান হয়; কিন্তু খালেদা পূর্ববৎ ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় স্বমত ব্যক্ত করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র।

ক্রমে সাহিত্য ক্ষেত্রেও-খালেদা প্রভূত যশের অধিকারিণী হইয়া পড়েন। তুর্কী সাহিত্যে ইঁহার নাম অমর হইয়াই রহিবে। ইনি তুর্কী ভাষায় কতকগুলি সুলিখিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষাতেও ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। ইংরাজী তিনি এত সুন্দর লিখিতে পারেন যে, অনেকের নিকটই ঐগুলি ইংরেজের লিখা পুস্তক বলিয়া মনে হয়।

নিম্নে খালেদা-প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইল :—

১। মাতা (ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ)
২। জীর্ণ-মন্দির
৩। হান্দান (উপন্যাস)
৪। হৃদয়ের ব্যথা (উপন্যাস)
৫। নবীন তুরাণ
৬। যাদুর কূয়া (গল্প)
৭। সবীয়ে তালিব
৮। ইশিলদাকের স্বপ্ন (গল্প)
৯। কানানের মেষপালকগণ (ক্ষুদ্র নাটক)
১০। আর্জরুমের এক নারী (এক দুঃখিনীর জীবন কাহিনী)
১১। আগুনের জামা (উপন্যাস)
১২। Memoirs of Halide Edib (খালেদা এদিবের জীবন-স্মৃতি)
১৩ The Turkish Ordeal (তুর্কীর পরীক্ষা)
১৪। Turkey Faces West (তুরস্কের প্রতীচী বরণ)

দেশ ভ্রমণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তুরস্কে ভীষণ গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন-পন্থীরা সংস্কার-প্রয়াসীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করে। কোন ব্যক্তিকে উদারনীতিক বা সংস্কারপন্থী বলিয়া সন্দেহ হইলেই সৈন্যগণ তাহাকে নিহত করিতে লাগিল। হত্যাযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহার নাম আছে জানিতে পারিয়া খালেদা সিরর যাত্রা করেন। আলেক্জান্দ্রিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ইনি বিলাত যাত্রা করেন এবং কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি শিক্ষা সম্বন্ধে ধারা-বাহিক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। প্রবন্ধগুলি শিক্ষাবিভাগীয় পরামর্শদাতা সইদ বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি খালেদাকে বালিকাদের নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করেন। এই স্কুলটি পরে কলেজে পরিণত হয়। খালেদা এই নূতন কলেজে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়ায় ইনি পরে পদত্যাগ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসানে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, রাজনৈতিক কারণবশতঃ কর্তৃপক্ষের

সহিত মতভেদ হওয়ায় খালেদা এদিব খানম পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ইউরোপে ও আমেরিকার বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতেও আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি অনন্যসাধারণ। ইংরাজীতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। আরও কয়েকটী বিদেশী ভাষাতেও তাঁহার দখল আছে। যখনই যে স্থানে তিনি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মোহিত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

বলকান যুদ্ধের সময় খালেদা কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা কর্ম্মী লইয়া তালি নিস্থান ক্লাব নামক তুরস্কের প্রথম মহিলা ক্লাব স্থাপন করেন। আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য ক্লাবের পক্ষ হইতে একটী হাসপাতাল খোলা হয় এবং বহু মহিলা শুশ্রূষা-কারিণী রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে। খালেদা আরও নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, এই সমস্ত কার্য্য কলাকের মধ্যে তুরস্কে এবং সিরিয়ায় শিক্ষা-প্রচার এবং শিক্ষা-সংস্কার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে খালেদা

শিক্ষা-প্রচার, সমাজ সেবা, সাহিত্য সেবা ইত্যাদি বিষয়ে খালেদা এদিব খানম যত বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার রাজনৈতিক সাধনাই তুর্কী জাতির নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে বিবেচিত হইয়াছে, কারণ তুর্কী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে কামাল আতাতুর্কের পরেই এই মহীয়সী নারীর স্থান।

আনাতোলিয়ায় মোস্তাফা কামাল পাশা যখন গ্রীক-দিগকে এশিয়া মাইনর হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, খালেদা তখন ছদ্মবেশে কনষ্টান্টিনোপল হইতে আঙ্গোরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কনষ্টান্টিনোপল তখন মিত্রশক্তির কবলিত এবং সুলতান তাহাদের হস্তে কলের পুতলীতে পরিণত। মিত্র শক্তি, পূর্ব্ব আনাতোলিয়ায় একটী নূতন আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র এবং স্মার্ণা অঞ্চলে গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বাকী অংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কামাল পাশার নেতৃত্বাধীনে আনাতোলিয়ার বীর তুর্কী যুবকগণ মিত্রশক্তির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন।

মোস্তাফা কামাল পাশা খালেদা এদিব খানমকে অত্যন্ত সম্মানের সহিতই গ্রহণ করেন। খালেদা রাষ্ট্রের বহু গুরুতর বিষয় সম্পর্কে কামাল-পাশা-প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেন। অবসর সময়ে তিনি কামান পরিচালনায় অভ্যাস করেন। হিলালে আহমর সমিতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া খালেদা এনকি শহরের হাসপাতাল যাইয়া যুদ্ধে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কার্য্যে ব্রতী হন। পরে খালেদা এই সমিতির সভানেত্রী মনোনীত হন। আত্মীয় পরিজন সকলে ভয় দেখাইয়াছে, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট খালেদার প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, কিন্তু খালেদা কিছুতেই দমিয়া যান নাই।

কেবলমাত্র শুশ্রূষাকারিণীর কাজ করিয়াই যে খালেদা ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর খালেদা সৈনিকদলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হন। ক্রমে খালেদা কর্পোরালের (Corporal) পদে উন্নীত হন। সাকেরিয়া যুদ্ধে খালেদার উপস্থিতির জন্যই শত অসুবিধাসত্ত্বেও তুর্কীরা গ্রীক-দিগকে পরাভূত করে। এইজন্য মোস্তাফা কামাল-পাশা স্মার্ণা অভিযানের সময়ও খালেদাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মোটের উপর, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার কাজের নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা ছিল না। দোভাষীর কার্য্য হইতে সরকারী কাগজপত্রের অনুবাদ, রিপোর্ট

প্রদান, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক রূপে ও এই অকুতোভয় মহিলা জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়লাভের পর খালেদা মোস্তাফা কামাল পাশার নিকট বিদায় লইয়া কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসেন। বিদায়কালে কামাল পাশা খালেদাকে সার্জ্জেন্ট মেজরের চিহ্ন এবং নিজের গায়ের কোট উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

—:•:—

ক্লান্তি

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী

চলিতে অনেক হ'ল, হে দেবতা, বাকি আর কত ?
জীবন-প্রভাত হ'তে চলিতেছি আজো অবিরত ;
মন্থর মধ্যাহ্ন বায়ে মর্ম্মরিছে অবসন্ন সুর,
তবুও চলেছি ধীরে, হে দেবতা, আরো কত দূর ?
সন্ধ্যা সে আসিছে ধীরে, আঁধারে ঘেরিছে চারিধার,
পথ তো হলনা শেষ ; কোথা প্রভু দেবতা আমার ?
এ আঁধারে কোথা পথ ? কোথা মোর এ পথের শেষ ?
কেবা বলে' দেবে মোরে ? নাহি দেখি আলোকের লেশ।
সাথী যারা হয়েছিল—মনে ছিল সাথে সাথে যাব,
তারাও ছাড়িয়া গেল—খুঁজিলে কি তাহাদের পাব ?
কাতরে ডাকিয়া ফিরি, কাছে দূরে কোথাও না পাই,
রাত্রির আঁধার মাঝে হে দেবতা, তুমিও কি নাই ?

———

হার-রয়েল হাইনেস্ প্রিন্সেস্ দর্‌রি শেহ্‌বার

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল মজিদের কন্যা। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আজম জা বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী।

"……ভারতীয় নারী সম্প্রদায়কে প্রগতি-পথে দ্রুত অগ্রগামিণী দেখিয়া আমি বাস্তবিকই উল্লসিত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর তাহা লইয়া এই প্রগতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।"

—দর্‌রি শেহ্‌বার।

ইব্‌সেন-সাহিত্য ও নারী-প্রগতি

শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ

নরওয়ের সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে হেনরিক ইব্‌সেন — নরওয়ের প্রতিভাবান সাহিত্যিক। তিনি নাটকীয় গদ্য সাহিত্যের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর নাটক,—সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার রূঢ় সমালোচনা। ইব্‌সেনের প্রথম নাটক "ডল্‌স্ হাউস্" বা 'খেলাঘর।' এই নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তিনি বিদেশে —স্বেচ্ছা নির্ব্বাসনে। স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অপরাধে ইব্‌সেন জনপ্রিয় হতে পারেন নি। "ডল্‌স্ হাউস্" বা "খেলাঘর" হচ্ছে নারীর বিকাশের কথা। শুধু স্ত্রী বা কন্যা ভাবে বিকাশ পাওয়া নারীর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। মেয়েদের নিজেদের যে একটা বিভিন্ন সত্তা আছে সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে তোলা হচ্ছে এই নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকের নায়িকা নোরা (Nora) পিতার আদরিণী কন্যা, স্বামীর সোহাগিনী পত্নী। বিহাহের পর সে স্বামীগৃহে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে "ঘর" করছিল। স্বামীর অসুখে সে তার এক পুরুষ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে। স্বামীর কাছে সেকথা গোপন করে সে বলে যে, তার বাবা তাকে টাকা পাঠিয়েছেন। নোরার এক বান্ধবী তাদের বাড়ি বেড়াতে এলে নোরা তাকে সব কথা জানায়। তাতে সেই বান্ধবী নোরাকে সাবধান করে দেয় বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে। এইখানে নোরার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। নোরার মনে বাষ্প জমে উঠলো এবং সেই মনের অবরুদ্ধ বেদনাকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। সে নিজে নিজেকে সহ্য করতে পারছিল না। এইখানে ইব্‌সেন নারী মনের যে দ্রুত উত্থাপন-পতন দেখিয়েছেন, তা অপূর্ব্ব। বড়দিনের উৎসব-রজনীতে নোরা তার স্বামীকে পত্র দ্বারা সব ঘটনা খুলে জানালো। স্বামী বল্লেন, "তোমাকে ছেলেমেয়ে পালন করবার বা ঘরকন্নার ভার আর দেওয়া যেতে পারে না।" বংশানুক্রমে পাপের ও মিথ্যার বীজ কেমন অগোচরে পুরুকন্যার চরিত্রের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে উঠে সৌজাত্য বিদ্যার সেই তথ্য কবি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলিয়েছেন। তারপর উত্তমর্ণ বন্ধকী দলিল বিনা সর্ত্তে প্রত্যর্পণ করেন। এর মধ্যে যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কবি তাঁর নাটকে বিষয়-বস্তু করে দাঁড় করিয়েছেন তার সম্পূর্ণ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। দ্বিতীয় পত্র পাঠে স্বামী স্ত্রীকে বুঝতে পারলেন এবং তার মত প্রত্যাহার করে সানন্দে বলে উঠলেন, "আমরা দুজনেই বেঁচে গেছি— তুমি যা করেছ সে আমার প্রতি প্রেমের জন্য।" উপসংহারে তিনি তাঁর "ছোট্ট ভীরু পাখিটিকে" মন হাল্কা করবার উপদেশ দিলেন।

নোরা কিন্তু খুব সহজ ভাবে জিনিষটাকে গ্রহণ করতে পারলো না। নারী মন পূর্ণ হয়ে উঠলো অভিমানে। নোরা জানাল তার স্বামীকে যে সত্যিকারের বোঝাপড়া তাদের মধ্যে হয়নি। নারীকে পুরুষ তার হাতের খেলার পুতুল করে রেখেছে। পিতা বা স্বামী তাঁদের মনের ইচ্ছামত কাজ করছেন। স্ত্রী কন্যারা শুধু সেই ইচ্ছার সমর্থন করেছেন। এই স্থানে কবি নোরার মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা যেমন সতেজ মনের স্ফুলিঙ্গ তেমনই নারী-মনের গোপন কাহিনী। নোরা সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করলো—নিজের নারীত্বের বিকাশ লাভের জন্য। নোরার এই যে গৃহত্যাগ তার মধ্যে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে। মনের যুদ্ধে ক্ষত

বিক্ষত নারীর এছাড়া আর উপায় ছিল না। ইবসেন সমাজ ভাঙতে চান নাই,—গড়তে চেয়েছেন। ক্ষতব্যাধি যে কোথায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সমাজকে ইঙ্গিত করেছেন সেই দুষ্ট ক্ষত সারবার জন্য। যাঁরা বলেন যে ইব্‌সেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁরা ভ্রান্ত। ইবসেন তাঁর নাটকে কোনখানেই তথাকথিত বৈপ্লবিক স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেন নি। ইব্‌সেন বলেন,—"ভাবী কালে ব্যবহারিক জগতে নারীর প্রভাব অনিবার্য্য, - কিন্তু তা মাতা রূপে এবং শুধু মাতা রূপেই।"

পুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে নারী মনের ঘনিষ্ঠতা যেখানে নেই সেখানে সমাজ ও গৃহ হয়ে উঠে অনড় ও অচল। এই অস্বাভাবিকতাকেই আঘাত করতে চেয়েছেন ইব্‌সেন। নারী ও পুরুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যেখানে এই একতা নষ্ট হয় সেইখানেই বিপ্লব বাধে। নোরার গৃহত্যাগকে বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে ভুল করা হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত অতিক্রম করবার জন্য ও ভবিষ্যৎ পুরুষের মঙ্গলের ইচ্ছায় নোরার এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ দরদী মন নিয়ে ইব্‌সেন নারীর কল্যাণ বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং নারী যে পুরুষের জননী, স্ত্রী, কন্যা, সখী, বান্ধবী, তার সঙ্গী এই সত্য ঘোষণা করেছেন। ইব্‌সেন স্বাধীনতার সমর্থক। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতার মধ্যে যথেচ্ছাচার ছিল না। কী ব্যথার ভারে নোরাকে ঘর ছেড়ে যেতে হয়েছিল তার বর্ণনা করতে যেয়ে ইব্‌সেন তাঁর দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট। য়ুরোপে নারী-প্রগতির অবরুদ্ধ ধারাকে তিনিই প্রবাহিত করেন স্রোতস্বতী-রূপে সময়ের চলিষ্ণুতার মধ্যে। নোরা গৃহত্যাগ করেছে কিন্তু দৃষ্টি তার ঘরের মধ্যে। সে স্বামীকে ও ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চেয়েছিল মিথ্যার ছোঁয়াচ থেকে।

য়ুরোপের মৃত সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন ইব্‌সেন। অনেকে বলেন ইব্‌সেনের নাটক অভিনয় উপযোগী হলেও ফরাসী নাট্যকার স্কাইব বা সারডুর নাটকের মত কলাসম্মত নয়। এই কথা সম্পূর্ণ ভুল। ফরাসী নাট্যকারেরা নাটকের থিওরির দিকে লক্ষ্য রাখতেন বেশী কিন্তু ইব্‌সেন "থিওরির" সাহায্য নিয়েছেন ততটুকু যতটুকু নাটকটি গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন।

বার্ণার্ড শ' ইব্‌সেনের পরম ভক্ত। তিনি বলেন—য়ুরোপে নব নাট্য-সাহিত্যে ও নব নাট্যালয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছেন ইব্‌সেন। গোল্ডস্মিথ ও সেরিডনের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীকাল য়ুরোপের নাট্য-সাহিত্য অন্ধকারে ডুবে ছিল। ইব্‌সেন সেই নিদ্রিত রাজকন্যাকে সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন।

দারিদ্র্যের অধিবেষ্টনে ইব্‌সেনের শৈশব অতিবাহিত। বাল্যে তিনি চিত্র-প্রতিভার পরিচয় দেন। এই চিত্রবিদ্যা তাঁর পক্ষে অর্থকরী হয় নাই। সেজন্য ইবসেন এক ঔষধের দোকানের কর্ম্মচারীরূপে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে কাটান। এর পর সাংবাদিকের কাজ নিয়ে ক্রিশ্চিয়ানায় চলে যান। এইখানে তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ২৫ বৎসর নির্ব্বাসনের পর ইব্‌সেন যখন দেশের মাটীতে পা দেন, তখন তিনি বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েন। কারণ সারা য়ুরোপ তখন তাঁকে সসম্মানে অভিনন্দিত করেছে। ইব্‌সেনের সপ্ততিতম জন্মোৎসব সুবিপুল আয়োজনের সহিত সম্পন্ন হয় এবং ক্রিশ্চিয়ানা থিয়েটারে তাঁর প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। এর পর দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৯০৬ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

লেডী মোহাম্মদ শফী

(পাঞ্জাবের পরলোকগত বিখ্যাত নেতা স্যার মোহাম্মদ শফীর পত্নী)

".....অন্তঃপুরের বাহিরে যে মুক্তির বাতাস নারী জাতির দেহ এবং মনকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছে তাহার বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিলাম।"

—লেডী শফী।

সত্যিকার

বেগম সুফিয়া এম্, হোসেন

নসিম!

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাদের কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি হ্যাঁ—তা ছাড়া উপায় কি। বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলুম, তোমরা আসতে দিলে না। তোমার মত অকপট বন্ধুর ভালোবাসা, মায়ের স্নেহ, তোমার বাবার ব্যবহার, সর্ব্বোপরি জোবেদার প্রীতি আমার কাছে লোভনীয়—যথেষ্ট কামা; তবুও আমি পালালুম। কিন্তু কেন পালালুম তা তোমরা বোঝ নি বলেই আমার উপর তোমার অভিমান বেশী। বিয়ে করতে আমি চেয়েছিলুম সে কথা ঠিক, কিন্তু জোবেদাকে নয়। তুমি রাগ করেই লিখেছ তোমার বোন আমার যোগ্যা নয়, তাই তাকে অবহেলা করে এসেছি। এ যে তোমার ভুল নসীম! বড় বেশী ভুল। জোবেদা যোগ্যতায় যে কারুর জীবন মধুময় করে দিতে পরে—এ কথা আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না—তুমিও না। জোবেদা তোমার বোন, আমারও। বোনের মতোই ওকে দেখি—দেখ্‌ব। আর প্রার্থনা করি, ও আমান উল্লার মতো স্বামী পেয়ে চির সুখী হোক—ওর স্বামীর ঘর ভরে দিক, মন ভরে দিক, ওদের কল্যাণ হোক!

"বিয়ে করব" বলেও আমি পালিয়ে এলাম। এই কথার উত্তর দিতে হবে। অনেক কথা বল্‌তে হবে। প্রথমে তাই মনে পড়েছে সেই বিদ্রোহী কবির কথা,—"একটী সূর্য্য আলো দেয় কিন্তু দুই সূর্য্য ধরায় উঠ্‌লে ধরণী দগ্ধ হয়ে যাবে।" সত্যি তোমাদের ভাব দেখে, অমন সুন্দর, অমন সরল শান্তির উৎস জোবেদার কথা ভেবে তোমাদের কাছ থেকে চলে এলাম। কিন্তু তোমাদের এই ভাব যদি জোবেদা টের পায়, যদিই বা আমাকেও চায়, সে দিন ওকে ঠকানোর ব্যথা আমি সইব কি করে? ধীরে ধীরে তোমরা আমার জন্য ফুলের শিকল গড়তে লেগেছিলে তাই আমি পালিয়ে বাঁচলুম। একটী নির্ধন প্রাণও বিড়ম্বনার হাত হতে রেহাই পেলো, নয় কি?

ছাব্বিশ বছর বয়সে আমি একটী মেয়েকে চেয়েছিলুম। তাকে এই তেত্রিশ বছরেও আমি চাইছি। তাকে আমি ভুলি নি। কাকে চেয়েছিলুম তা তোমরা জানো না তবুও আন্দাজেই আমি যে কাউকে ভালো বেসেছি তা বুঝেছিলে কিন্তু সে যে কি ভালোবাসা, কতখানি ভালোবাসা, তা বুঝতে পার নি। ভেবেছিলে আমি তাকে ভুলে গিয়েই বিয়ে করতে চাইছি। আমার পরম হিতৈষী অকপট বন্ধু তুমি খুশী হয়েই আমার হাতে তোমার একটীমাত্র বোনকে তুলে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে দ্বিধা করো নি। এ যে তোমার কতখানি ভালবাসা আমার প্রতি তারই প্রমাণ তা আমি বেশ উপলব্ধি করছি। তবুও নসীম..... প্রথম জীবনের যৌবনের প্রভাতে সেই যে আমার চাওয়া! সে কি দুর্ব্বার আগ্রহ, আকুল চাওয়া! পেয়েও পাইনি, কি করে তাকে ভুলব? অসীম রহস্য তোমার চোখের সামনে—তা আমি বুঝতে পারছি—তাই আজ সবই তোমায় বলে তোমার মনের ধাঁধাঁ ঘুচিয়ে দিতে চাই।

"সারাকে" তুমি জানো! তাকে দেখো নি কিন্তু নাম-ধাম, গুণগ্রাম, সবই জানো। আমার রুচি দেখে হয়ত নাক সিটকাবে। তা সিটকাও, কিন্তু আজ ওর কথায় আমার জীবনের ইতিহাস

গড়ে উঠছে তা তোমাকে শোনাতেই হবে। ও সুন্দরী কি কুৎসিত তা আমি বলব না; কারণ আমার চোখ আজ বিশ্ব-ভুবনে ওকেই সুন্দরী দেখছে।

অন্তর ওরই কথায় ভরে গেছে—ও ছাড়া কোনো কিছুতে আমার এত মন লাগেনি কখনও। প্রথম যখন তাকে দেখি তা'র তখন অসুস্থ অবস্থা—আমাকে ডেকেছিল অসুখ করতে। ও শুয়েছিল। শীর্ণ সুন্দর দেহটী ওর দাবদগ্ধা একগুচ্ছ শিউলির মতো বিছানায় এলিয়ে রয়েছে। বেলা শেষের সঙ্গে জ্বর বেড়ে উঠছে—মুখখানা রক্তিম, চোখ দুটী ছলছলে—বাম ভুরুর উপরে ছোট্ট একটী কালো তিল। হেনা-রঞ্জিত শীর্ণ হাতখানি ললাটে ঠেকিয়ে ও আমাকে সালাম জানালে—আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেয়ালী জ্বেলে ওকে দেখেছিলুম—মনে হল সুন্দর! অপরূপ! সেই দিন থেকে আমি যতবার ওকে দেখেছি প্রতিবার সুন্দর হতে সুন্দরতর দেখেছি বলেই মনে হয়। 'ওকে বাঁচাতে হবে'—'ও আমার।' আমার মনে প্রথম দিন থেকে এই খেয়াল গভীর হয়ে আসন গেড়ে বসল। ও যদি না বাঁচে আমার জীবনও যে মরে যাবে। তাই শুধু নিজের উপরই বিশ্বাস না করে শহরের বড় বড় ডাক্তারকে দেখাতে আমি ক্রটী করিনি, তারা সবাই ভয় নেই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, পূর্ণ বিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠেছে—ও আমার জীবনে খোদার প্রথম দান—ও বাঁচবে, আমার সমস্ত জীবন ওকে নিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠবে। সত্যি-ই ও আশ্চর্য্যরূপে শীগ্‌গীরই ভালো হয়ে উঠল। রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়ে ও আমাকে বল্লে—"এবারে আপনিই আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন।" আমি বল্লুম—এবারে চেঞ্জে যেতে হবে। তা হলে শরীর শীগ্‌গীর সেরে উঠবে। অকস্মাৎ ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চোখে ঘনিয়ে এল বিষাদ। মুখের উপর কালিমার ছায়া; ক্লান্ত, ব্যথাহত স্বরে সারা বল্লে—এমনি বেশ সেরে উঠ্‌বে, আবার চেঞ্জ! বাধা দিয়ে আমি বল্লুম—বেঁচে থাকতে হবে, শরীরও সারাতে হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন? কোন্ জায়গা পছন্দ হয় বল্লে আমি সব ঠিক করে দেই। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ও বল্লে,—কী হবে শরীর সারিয়ে? কোথা যাব আমি? কোথাও যাব না—বলতে বলতে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। আমি বিস্মিত ব্যথিত হয়ে বল্লাম—এ কী ছেলেমানুষি, এতে কাঁদবার কী আছে? না গেলে নাই গেলে, তোমাকে ত কেউ আর জোর করে পাঠাবে না। উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চাপ্‌তে সারা বল্লে—আপনি এখন যান—পরে যা হয় বলব। হতবুদ্ধি হয়ে চুপ হয়ে গেলাম। কী বলব ওকে। মনে হল, একবার আমার সব কথা জানিয়ে ওকে আজ থেকে শুধু আমারই করে নেই। কিন্তু ও কী ভাববে? ওর জীবন যে স্রোতে বয়ে চলছিল এত-দিন, আজ কদিনের পরিচয়েই কি সেই মুক্ত স্বাধীন জীবনের মায়া কাটিয়ে ধরা দেবে আমার একক জীবনের সাথী হয়ে! মনে দ্বিধা সন্দেহের দোলা জাগল। আমি কিছুই বলতে পারলুম না। তখন কি জানতুম, ও আমাকে চায়! আমি আমার সমস্ত আশা ভরসা বুকে করেই বেরিয়ে এলুম!

ধীরে ধীরে ও ভালো হয়ে উঠল। আমি প্রতি-দিন একবার যেতুম ওখানে—হয় সকালে নয় দুপুরে, বিকালে কিম্বা সন্ধ্যায় যখনই সময় পেতুম। কেন যে যেতুম তা কি আর নতুন করে বলতে হবে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই কয় দিনে দেখলুম না ওর কাছে কোনো রূপ-মুগ্ধ ভক্তেরা এলো, অথবা ওর গান—যা ওকে সর্ব্বজন-বিদিত করেছে—সেই গানের সুর-মুগ্ধ কোনো জনকে। আশ্চর্য্যের সঙ্গে একটু তৃপ্তিও বোধ করলুম। তা হলে ওর কথা যা শুনেছি সবটুকু সত্য নয়—শুধু ও গায়িকা; সামান্য রূপ-জীবিণী ও নয়। কতদিন বলতে গেছি—তুমি এস আমার

অন্তরলক্ষ্মী, আমার গৃহলক্ষ্মী হয়ে যদি তুমি ত্যাগ করতে পারো তোমার অতীত জীবনকে। কিন্তু সঙ্কোচ কুণ্ঠায় আমি ওকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারিনি ··· ··· একদিন শুনতে চেয়েছিলাম ওর গান। সারা মুখ আরক্তিম করে ও বল্লে,—এখন আর সে গানের গলা নেই? কি শুনবেন! আমারও সে দিন জেদ চড়েছিল অনুরোধ মিনতির চেয়ে বেশী তাই বল্লুম—তোমার অসুখ, তা আমি ডাক্তার সে কথা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? এখানে তুমি নিজের মনে গাইবে, কেউ তোমায় বারণ দিচ্ছে না ত। কথাটা বলে ভালো করিনি বুঝলুম। সে একবার চকিতে চেয়ে বল্লে—আর একদিন শোনাব; আজ মাপ করুন। আমি চুপ হয়ে গেলুম। মনটা ভার হয়ে উঠল—কোন কথা কয়েই আর সঙ্কোচ কাটাতে পারলুম না। ও নিজেই হেসে বল্লে—অতখানি গম্ভীর আপনার না হলেও চলবে। কি ভাবছেন? কটা রোগী সারাবেন তাই না? আজকাল আর লোকের বেশী ব্যারাম হয় না তাই? ডাক্তারদের ত এই ই ভাবনা। আমিও হেসে ফেল্লাম; বল্লাম—তা ছাড়া আর খেয়ে দেয়ে আমার কাজ নেই বুঝি, তাই রোগী মারবার মতলবে আছি বলেই তোমার বিশ্বাস। ও বল্লে, তা নয় ত কি? আচ্ছা আপনি ত এখানেই বসে সময় কাটান। রোগী দেখেন কখন? এই রকম করে বাইর পশার করবেন?

বল্লুম,—পশারের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু সত্যিই কি আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকি?

হাস্যোজ্জ্বল চোখ নত করে ও বল্লে—থাকেনই ত।

—তাতে ক্ষতি?

—ক্ষতি নয়?—এতক্ষণ আরো অনেক রোগী দেখা যায়।

—তা নাই বা দেখলুম—কিন্তু তোমার যদি কিছু ক্ষতি হয় বলো, না হয় নাই আসব।

—আমার না হোক আপনার ত ক্ষতি—তারই জন্য না আসাই ভালো।

—বেশ তবে আসব না।····· চল্লুম তা হলে।··· কিন্তু কোনো সময়ে তোমার দরকার হলে আমাকে ডেকো, আমি আসব।—বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম। ও যেন আশ্চর্য্য হয়েই নির্ব্বাকে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি চলে এলুম, আসতে আসতে ভাবলুম ও কি মানুষ! ও আমাকে তা হলে বুঝেনি এত দিনেও। তবে আমি গেলে ওর আনন্দ উৎসাহ বেড়ে ওঠে কেন! আজ এমনি করে চলে আসা উচিত হয়নি আমার; যা হয় একটা কিছুর সমাধান করাই ভালো হত। নিজের উপর রাগ হল····· ও না ডাকলে আর যাব না বলেছি। কিন্তু সে কথা রাখতে পারলুম না। পরদিন বাইরে যাবার আগে একবার ওর ওখানে গেলুম, শুনলুম ও বাড়ী নেই। আরো দেখলুম, ওর এতদিনকার ফেলে রাখা গানের বই, বাজনাগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। ভাবলুম, ব্যাপার কি? ওকি আবার নতুন করে পুরাতন পথ ধরে চলতে সুরু করবে? মনটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। সে দিন হাঁসপাতাল থেকে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেল। বিকেলেও তাকে গিয়ে পেলুম না; শুনলুম বাইরে গেছে। নিজের উপরই রাগ করে আর তিন দিন ওর ওখানে গেলুম না। সে দিন হাঁসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে দেখলুম ও একটা স্লিপ লিখেছে, "আজ বাইরে যাবার আগে একবার আসবেন দরকার আছে।" এইটুকুরই প্রত্যাশায় যে ছিলুম; চিঠি পেয়ে আর দেরী করলুম না, খেয়েই ওর ওখানে চল্লুম। হেমন্তের হরিৎ শোভা আজ আমার চোখে ভারী মনোরম বোধ হল। কেন জানি না, মনে হল আজ ওকে আমার করে নিতে পারব—আমার এতদিনের স্বপ্ন আজ সফল হবে।

ওর ওখানে গিয়ে শুনলুম ও নাইতে গেছে এত বেলায়! জানলুম বাড়ী ছিল না, এইমাত্র ফিরেছে। আমি বসলুম। ও নেয়ে একটুও দেরী করল না, বেরিয়ে এল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে। আমি ওর দিকে চাইতে দু চোখের দৃষ্টি যেন আমার জড়িয়ে গেল। নতুন করে হাতে পায়ে মেহেদী পরা, লাল টকটকে সাড়ীর পাড়টী পায়ের পাতায় লুটিয়ে পড়েছে। সদ্য-স্নাতার ভুরুর চুল আঁখিপল্লব তখনও আর্দ্র। সিক্ত কেশপাশ তোয়ালে জড়িয়ে বেঁধেছে টেনে, তার বাঁধন ভেদ করে মাথায় দেওয়া কাপড় ভিজে উঠেছে। সুরভি সাবানের স্নিগ্ধ গন্ধ ওর গা থেকে তখনও যায়নি; আমি তৃপ্ত হলুম। সারা ঘরে হাসির মাধুর্য্য ছড়িয়ে ও বল্লে—আপনি এখনি আসবেন জানলে আমিও আগে তৈরী হতুম কিন্তু।—বাধা দিয়ে আমি বল্লুম,—এইমাত্র বাড়ী ফিরে নাইতে গেছ জানি; কিন্তু আবার কি রোগে পড়তে চাও, খাবে কখন, কি জন্য ডেকেছিলে?

সারা বল্লে—কাজে দেরী হয়ে গেল; ডেকেছিলুম গান শোনাব বলে।

—তার জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল কি?

—গেছলুম কাজে।

—সে আমি বুঝেছি কিন্তু কি কাজে এত বেলা পর্য্যন্ত নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিতে হল তাই বল।

চকিত দৃষ্টি একবার আমার উপর ফেলে ও বল্লে—সঙ্গীত সমিতিতে একটা কাজের জোগাড় করলুম তাই।

—ও তার জন্য বাজনাগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। আমাকে গান শোনাবে ও একটা শুধু কথা। তা কাজ নেবার কি খুব দরকার মনে হয়েছে?

—নিশ্চয়ই, বেঁচে থাকলে খেতে পরতে ত হবে তার উপায় করা চাই না—

—এতদিন সেটা চলত না কি?

বোকার মতোই কথা বল্লুম নয় কি? ওর মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান, গম্ভীর হয়ে এল, বল্লে—সে যা চলেছে, চলেছে, এখন যেরূপে ইচ্ছা চালাব। আপনি গান শুনতে চেয়েছেন কতদিন কিন্তু শোনাইনি। প্রাণদাতা উপকারীকে একটুখানিও যদি আনন্দ না দেই তা হলে যে মনে দুঃখ থাকবে। তাই ডেকেছিলাম কিন্তু এই দুপুর বেলা, অসময়—আচ্ছা আর একসময় না হয় আসবেন। আমি বল্লুম—আজ আর যেতে বল্লেই আমি যাব না। তুমি খেয়ে এস কথা আছে। ও ভালো হয়ে বসল, বল্লে—"খাওয়া পরে হবে, বলুন কি বলবেন। বল্লুম—না, তুমি খেয়ে এসো আমি বসছি, আর অনর্থক দেরী করো না, যাও। ও চুপ করেই এবার উঠে গেল। আমি একখানা গানের বই নিয়ে দেখতে লাগলুম। পাঁচ মিনিটও হল না, ও খেয়ে এলো, পান পর্য্যন্ত হাতে। ও বল্লে—পান খাবেন? বল্লুম—না, তুমি খাও। বসো, কয়েকটা কথা বলব। ঠিক উত্তর দিয়ো যা জিজ্ঞাসা করব। টুকটুকে ঠোঁট দুটী চেপে হাসি লুকিয়ে ও বল্লে—যদি না দেই?

—তা হলে এই শেষ; আর তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রাখব না।

ও বিবর্ণ হয়ে গেল। ঢোক গিলে বসে পড়ে বল্লে—বলুন শুনছি।

বল্লুম—আগের কথা নাই বল্লুম কিন্তু বর্ত্তমানে কি তোমার কাজ না নিলেই চলত না—এতই নিঃস্ব তুমি?

—হ্যাঁ।

—তা এ ছাড়া ত অন্য উপায়ও করতে পারতে।

—কি?

—যদি কেউ তোমার ভার নিতে চায়, তুমি রাজী?

—আমার ভার নেবে? কে? কেন নেবে?

—নেবে তার নিজের গরজে।

—সে কেউ চাইবে না।

—যদি কেউ চায়?

—কেউ চাইবে না।

—আমি বলছি যদি চায়?

—সব জেনে শুনেও?

—হাঁা সব জেনে শুনে, তোমাকে চিনে দেখেও।

—সে তার পাগলামী।

—সে না হয় পাগলামীই হল কিন্তু তোমার ইচ্ছা?

—যত সব বাজে কথা বলছেন। কেউ চাইবে! যদিই বা চায়, পাগলামীই ত—আমি সে পাগলামীর খোরাক যোগাতে রাজী নই। বলুন অন্য কথা কিছু যদি বলবার থাকে।

ও বল্লে বটে এত কথা, কিন্তু এরি মধ্যে ওর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠছে। সমস্ত দেহ উঠেছে চঞ্চল হয়ে। ওর পানে চেয়ে আমি একটুকাল চুপ করে রইলুম, পরে বল্লুম—

—প্রায় মাস খানেকেরও উপর হয়েছে তোমার এখানে আসছি। তার আগে অবশ্য তোমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা হয়নি, কারণ তুমি ছিলে অসুস্থা, কিন্তু এত দিনে কি আমার মধ্যে কোনো পাগলামীর লক্ষণ দেখেছ? স্পষ্ট দেখলুম ও ভয়ানক চমকে উঠল। সারা দেহে ওর রোমাঞ্চ জাগল। ভীত, ত্রস্ত চাউনীতে চেয়ে কম্পিত, কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্লে—

—না—কিন্তু সে কথা কেন?

—তা হলে আমি পাগল নই? যদি আমিই তোমায় চাই, দেবে তোমার জীবনের ভার আমাকে বইতে? থর থর করে কেঁপে ও আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি বল্লুম—উত্তর দাও! চোখ নামিয়ে ও বল্লে—আমাকে নিয়ে আপনি কি করবেন? আমার পরিচয় কি আপনি পান নি?

—"হাঁ পেয়েছি কিন্তু তবুও চাইছি জোর করে নয়, দয়া করে নয়, আমার সারা অন্তর দিয়ে, সারা জীবন দিয়ে, তোমার জীবনের যত অভাব পুরিয়ে দেবার জন্য। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমার সাথী হও, নয়ত যদি যদি অন্য কেউ তোমায় আমার মতো চায় বা তুমিও আমার মতো তাকে চাও, তাতেও আমি সুখী হব। কিন্তু এই জীবন তোমার ব্যর্থ, নিরর্থক না হয় আমি তাই চাই।—অকস্মাৎ প্রবল কান্নায় ও ভেঙ্গে পড়ল। উচ্ছ্বসিত সিন্ধু-হিল্লোলের মতো বেলাভূমে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। কান্নায় কম্পিত ওর দেহ-উর্ম্মি—সে এক অপূর্ব্ব সুষমা! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলুম। সাহসও হ'ল না সান্ত্বনা দেবার। অসুখের মধ্যে কতবারই ওকে ছুঁয়েছি; কিন্তু ও ভালো হবার পর থেকে ইচ্ছা করেই অতি নিকটে এসেও সান্নিধ্য কাটিয়ে দূরে রয়েছে। প্রত্যেক বার আমি খুবই লক্ষ্য করেছি। আজ ওর কান্না দেখেও আমি তাই হঠাৎ ওর কাছে যেতে পারলুম না। ক্রমেই ওর কান্না বাড়ছে। আমি বসে আছি। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল। সারা দেহ তখনও কাঁপছে; অশ্রু-সজল, ম্লান সে সুন্দর মুখ। এবারে আমি উঠে দাঁড়ালুম; ওর একেবারে কাছে গিয়ে বল্লুম—না জেনে আমি কি তোমায় অসঙ্গত কিছু বলেছি সারা? ঘাড় নেড়ে ও হাঁ কি না বল্লে বুঝলুম না, ওর পুষ্পপেলব কম্পিত হাতখানা ধরে আরো কাছে সরে যেতেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে হাত ছাড়িয়ে নিলে। চঞ্চল পায়ে দুয়ারের দিকে চলে যেতে যেতে ফিরে চাইলে। ওর মাথার কাপড় তখন খসে গেছে, সিক্ত, সুরভিত, শিথিল কেশপাশ খুলে ওর অশ্রুসজল মুখের, কম্পিত দেহের আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বল্লুম—যেয়ো না সারা একটা কথা শোনো। ও দাঁড়াল। বল্লুম—শুধু বল তোমাকে আমি ব্যথা দিলুম না। বজ্রাহতা বল্লরীর মতো ও আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অস্ফুট বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে ও বল্লে—না না—আমাকে বাঁচাও তুমি দেহে মনে। কিন্তু যা আজ বল্লে তা হয় না, হবে না!

আনন্দে আবেগে আমার অন্তর ভরে উঠল। তা হলে সারাও আমাকে ভালো বাসে। জীবন ওর ধূলি-মলিন, সমাজ ওকে সাদরে বরণ করে নিবে না, কিন্তু রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা-সৌন্দর্য্যে ও কোনো শরীফজাদীর চাইতে কম নয়। তার পরিচয় ত আমি নিত্যই পেয়েছি। গৌরবে আমার মন ভরে উঠল। আমি নত হয়ে পরম তৃপ্তিতে ওকে কাছে আকর্ষণ করলুম—তড়িত বেগে ও আমার হাত ছাড়িয়ে বল্লে—এত ভাগ্য আমার সইবে না; এ হবে না, তুমি যাও—আর কখনও এস না তুমি। পাশ কাটিয়ে ক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠে এত কথা বলে বিদ্যুৎ গতিতে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ও আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলে। শব্দ পেয়ে ওর বুড়ী চাকরাণী চাকর সবাই দৌড়ে এল। হতবুদ্ধি হয়ে আমি বসে রইলুম। রুদ্ধ দুয়ারের অন্তরাল হতে কাতর কান্নার করুণ শব্দ তখনও এসে আমার কাণে বাজছিল। কিন্তু কি করব আমি! বৃদ্ধা চাকরাণীটী ওর এক মাত্র হিতৈষিণী। আমাকে অমন ভাবে থাকতে দেখে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সে বল্লে--আপনি এখন বাড়ী যান বাবা! ও মেয়ে ভয়ানক জেদী। ওকে আর শীগ্‌গীর বের করা যাবে না। লোকে যাই বলুক, কিন্তু শুধু এক জেদ ছাড়া অন্য কোনো দোষ ওর নেই, সে আমি জানি। আর আপনিও ত দেখছেন। আমি ছোট কাল থেকে ওকে দেখছি। ওর কপাল মন্দ তাই ভাগ্য-বিপাকে এই পথে এসে ঠেকেছে; নয় ত—বলতে বলতে বৃদ্ধার দুই চোখে অশ্রু ঘনিয়ে এল। আমি নিশ্বাস ফেলে উঠে চলে এলাম। ওর বাড়ী আর যাব না, এই প্রতিজ্ঞা এবার দৃঢ় ভাবেই করলুম।

প্রায় ২০।২৫ দিন হয়ে গেল—আর গেলুম না। হঠাৎ এল আমার বদলীর হুকুম। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; ওকে না জানিয়েই চলে যাব! কী করে যাই। ওরও ত পরিচয় পেলাম। ও যদি আমাকে ভাল নাই বাসত, কেন অমন করে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে? হয়ত কত জন এমনি আমার মতো ওকে চেয়েছে। সবাইকে ত বিমুখ করেছে পরম হেলায়, আমার বেলায় ওর এত কাতরতা কেন? কেন বল্লে, 'তুমি আমায় বাঁচাবে'। তুমি বলে প্রথম এই সম্বোধন ওর অন্তরের একান্ত আপন বলেই ত করেছে; তবু কেন ও ধরা দিল না আমার এই ব্যাকুল বাহুর বাঁধনে কে বলবে? নারী তার অন্তর-রহস্য এমনি করে গোপনে রাখে বলেই তাকে বলে কবিরা কুহেলিকা।

আজো তাই দুপুরে গেলুম ওর কাছে। সকাল-সন্ধায় ও বাড়ী থাকে না জানতুম। দুয়ারের বাইরে থেকে শুনলুম ওর সুন্দর কণ্ঠের গান যা অনর্থক কুণ্ঠায় ও আমাকে কোনো দিনই শোনাল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই সুরের সুবাস আমার অন্তর ভরে গ্রহণ করলুম। ও গাইছিল—"ঘুম ঘোরে এসে মনোহর।—" সমস্ত অন্তর উজাড় করে গানে প্রাণ সঞ্চার করে গাইছিল, তাই এত মধুর! সহসা বাধা পেলাম। ওর বারোয়ান এসে 'সেলাম সাহেব' বলাতে অগত্যা আমাকে ভিতরেই যেতে হ'ল। বরাবরই অবারিত দ্বার আমার, আজো তাই ঢুকে পড়লুম। আমাকে দেখে ও দাঁড়িয়ে গেল - আনন্দ উজ্জ্বল, পুলকে চঞ্চল, খুশীতে ও ঝলমল করে উঠ্‌ল, কথা কইতে পারলে না। দেখলুম ও একটু শীর্ণ হয়ে গেছে যেন, তাই বল্লুম—রোগা হয়ে গেছ দেখছি, অসুখ করেছিল?

—হাঁ একটু—কিন্তু এতদিন পরে এলেন যে বড়?

—তুমি ত অসুখের সময় আমায় ডাকলে পারতে। না ডাকতেও যখন এলাম তখন এ কৈফিয়ত চাওয়া সাজে কি?

ও নীরবে একটু হাসলে, বল্লে—আমি জানতুম, একদিন আমার খোঁজ নিতে আসতে হবে।

—সবই জানতে! জানো যদি সব, তবে আমায় জ্বালিয়ে মারছ কেন?

ম্লানমুখে ও বল্লে—আমার ভাগ্যের বিড়ম্বনায়।

—মিথ্যা কথা, এ শুধু তোমার একটা জেদ।

—জেদ—কী জেদ—কিসের জেদ?

—তা তুমিই জানো, কিন্তু অনর্থক তুমি নিজেকে বঞ্চিত রেখে আর একজনকেও বঞ্চিত করছ, একি ভালো করছ?

—ভালো কি মন্দ তা আমি কি করে বলব। আমি নিজে ভালো নই তাই ভালো-মন্দ জ্ঞানও আমার আর নাই।

—সে না থাক। কিন্তু জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ আর শুভলগ্ন একবার বয়ে গেলে আর আসে না। আজ হয়ত সমস্ত সম্পদের চেয়ে তোমার কাছে তোমার খেয়ালের মূল্যটাই বেশী কিন্তু একদিন তোমায় আফ্‌সোস হবে। সে দিন আর এ পথ তোমার খোলা থাকনে কি?

আমি অদৃষ্টবাদী—অদৃষ্ট মানি। কাজেই যা আজ, এসেছে যদি আমার ভাগ্যে এই সত্যই লেখা থাকে—তবে এ চিরন্তন, শাশ্বত, অবিনশ্বর হয়ে আমার থাকবেই। এর জন্য আমার হারানোর ভাবনা ভেবে কাজ নাই। সে যখন সত্যই আসবে যে ক্ষণে, যে দিনে—সে যত দূর, যত দীর্ঘদিন পরেই আসুক, সেই দিন হবে আমার শুভ দিন, সেই ক্ষণ আমার মাহেন্দ্র ক্ষণ, সফল লগ্ন;—তার জন্য আমাকে পথ তৃণতে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

বলতে বলতে স্বর ওর গাঢ়, গম্ভীর, প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ল। ও সব বোঝে, সব জানে, তবুও এই কথার হেঁয়ালি! কিন্তু কি করে ওকে বোঝাই কত বড় ওর ভুল! আমার অন্তর, আমার চোখ, আমার অনুভূতি কি ওর মধ্যে আমি সঞ্চার করতে পারি না? তবুও ওর সঙ্গে তর্ক করতে পারলুম না। যদি কোনো পুরুষ এমনি তর্ক করত, যুক্তিতে খণ্ডানো সম্ভব হত, কিন্তু একটী মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি তর্ক করব। আমি তাই চুপ করেই রইলুম। সেও কতক্ষণ চুপ করেই থাকল; পরে বল্লে—রাগ হল?

একটা নিশ্বাস আমার অন্তর ভেদ করে বেরিয়ে এল। বল্লুম—রাগ নয় কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আজও তুমি আমায় ভুল বুঝছ। আমার উপর নির্ভর নেই, বিশ্বাস নেই, এই আমায় দুঃখ।

ওর মুখ নত হয়ে গেল; বল্লে—আজ আপনি যেটা মনে করেছেন সত্য সুন্দর, তাকে পাওয়া চাইই—দুদিন পরে হয় ত সেইটাই ভাবতে পারেন এ অসত্য, অসুন্দর। হয়ত তা থেকে মুক্তি পেতে আপনার জীবনের শান্তিটুকুই হারাতে পারে।

--সে যাই হোক, কিন্তু আজ আমি তোমাকে শেষ বলছি, আজ যদি আমার কথার উত্তর দাও, আমি ধন্য হয়ে তোমাকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করে থাকতে পারব। কিন্তু অনর্থক তোমার দুয়ারে ভিখারীর মতো দীনতা দেখাতে, বিড়ম্বনা ভোগ করতে আমি রাজী নই।

দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট এই অভিযোগের প্রতিবাদ ফুটিয়ে ও বল্লে—আমি ত বলিনি কাউকে কোনোদিনই নিজের দীনতা প্রকাশ করতে; আমার কি আছে—কি দিয়ে আমি অতখানি আশা করব?

ক্রমেই আমার অসহ্য লাগছিল। বল্লুম—সে আছে কি না আছে তার কথা এখন থাক। আজ থেকে আমি বিদায় হলুম। যদি তোমার কোনোদিন আমায় দরকার হয়, ডেকো। আমার বদলীর হুকুম এসেছে, ঠিকানা রেখে যাচ্ছি।

হঠাৎ ও চকিতা হরিণীর মতো চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সামলে নিয়ে বল্লে--"মিথ্যা কথা", "মিথ্যা কথা।" আমি বল্লাম আমার মুখে কখনও মিথ্যা কথা শুনেছ? সত্যিই আমি যাচ্ছি; অবশ্য এক সপ্তাহ সময় আছে—এর মধ্যে যা ভালো মনে করো আমাকে জানিও—আমি চল্লুম।

ফিরে আর তাকাবার ইচ্ছা হল না। ইচ্ছা করেই কঠোর হয়ে, মুখ ফিরিয়ে ওর কাছ থেকে চলে এলুম—

নসীম! জীবনে মানুষের এক একটা সময় আসে তখন তার যা কিছু সবই হয়ে ওঠে দুর্ব্বার ও অদম্য। সমস্ত দুনিয়া একদিকে—আর নিজের মত একদিকে—এত শক্তিমান, এত অপরাজেয় সে নিজেকে মনে করে। তখন বুঝি তার ইঙ্গিত আকাশ বাতাস নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—সমস্ত জগতে তার আসন আবৃত করে সে বিজয়ী হয়ে জানাতে চায় আমি আছি আমার শক্তি আছে, আমার সাধ্য কতখানি দেখো। কিন্তু সে তার শুধু স্বপ্ন-কল্পনাই নসীম! তাই ওর ওখান থেকে ফিরবার পথে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল—কত দুর্জ্জয় ছিল আমার মন, দৃঢ় ছিল আমার প্রতিজ্ঞা, কত উচ্চ ছিল আমার আশা, কিন্তু একটী-মাত্র নারী—কুসুমপেলবা, সামান্য শক্তির যে অধিকারিণী—আজ আমার সব কিছুর মাধুর্য্য হরণ করে নিল পরম হেলায়! আশ্চর্য্য মানুষের মন। আজ শুধু সারার অভাবেই বিশ্ব-ভুবন যে নিঃস্ব হয়ে গেল। এ কি দীনতা! এ কি পরাজয় পুরুষের! আজ দুদিন ধরে তোমায় লিখছি চিঠিখানি কিন্তু শেষই হচ্ছে না। কত কথার মাধুর্য্য, কত হারানো স্বপ্নের খেই এর মধ্যে বাদ থেকে গেল, তবুও আজ তোমাকে এর শেষ শোনান চাই; কিন্তু সুদীর্ঘ সাত বছরের বিলম্বিত কথার মালা এত সহজেই কি গাঁথা হয়? তবু মনে হচ্ছে, অন্তরের অনন্ত, অকথিত কথা আজ আমার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে শুধু তোমার ভুল ভাঙাতে নয়, আমারও রুদ্ধ ব্যথা বিলাসের বিকাশ-আগ্রহ নিয়ে।

যা বলছিলাম—আমি ফিরে এসে সেইদিন রাত্রের ডিউটীতে গেলাম। সেখান থেকে ফিরবার পথে সুধীর—আমার সতীর্থ, এসিট্যাণ্টও আমার সঙ্গে ছিল। ও বল্লে—তোমার ত বদলী হয়ে গেল, কিন্তু একটা কথা বলব কিছু যদি মনে না করো।

আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় আমার মন ভারাক্রান্ত ছিল; অন্যমনস্ক হয়ে বল্লুম—বলো যা বলবার তার জন্য অত ভণিতা কেন!

সুধীর একটু সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত কণ্ঠেই বল্লে—তুমি কি একাই যাবে, না সঙ্গিনী সহ?

একটু বিস্মিত হলুম, বল্লুম—সঙ্গিনী ত এখনও পাইনি তা সঙ্গে নেবো কি?—

সুধীর বল্লে—কিছু মনে করো না; কিন্তু কদিন থেকে শোনা যাচ্ছে; সারা বেগম নাকি এবার তোমার গৃহলক্ষী হয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি—

বাধা দিয়ে বল্লুম—থাক, আর আমি শুনতে চাই না; কিন্তু সারা যদি আমার গৃহলক্ষী হতই—সত্যিই তা হলে আমি খুশী হতুম; কিন্তু কথাটা কারা বলছেন বলতে পারো?

সুধীর একটুখানি চুপ থাকল, পরে বল্ল—হাওয়ায় অবশ্য ভেসে আসেনি; কিন্তু আজ আর কার নাম নিয়ে বলব? কিন্তু তোমার মুখেই যখন এত কথা শুনলুম, এ কথা নিয়ে আর আলোচনায় ফল কি? তা তিনি কি তোমার কথায় রাজী নন্?

আমি তখন ভাবছিলুম হাজারো কথা—প্রেম, আগুন আর ফুলের গন্ধ এর প্রকাশ কি এতই তীব্র? এত এর ব্যাপ্তি?—বল্লুম—রাজী কি গররাজী তার সঠিক খবর তোমায় দিতে পারব না, কিন্তু ওকে যাই বলে তোমরা জানো,—আমার গৃহলক্ষী হবার যোগ্যতা ওর কোনো মেয়ের চাইতে কম নয় বরং বেশীই; কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ তার যোগ্যতা বুঝবার তার নিজেরও সাধ্য নেই।

সুধীরের বাড়ী এসে পড়েছি। আমি ওকে নামিয়ে দিয়ে একা মোটর চালিয়ে দিলাম। মাঠে মাঠে তখন জ্যোৎস্নার হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম্য

হার হাইনেস্ রামপুরের বেগম সাহেবা

রামপুর রাজ্যের বর্ত্তমান নবাব ও বেগম সাহেবা উভয়েই উদার মতাবলম্বী। কিছুকাল পূর্ব্বে বেগম সাহেবা ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন, সেখানকার নারী-সমাজেও তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন।

পথ জনশূন্য—কুমারীর শুভ্র সিঁথার মতো এঁকে বেঁকে সে নিবিড় বৃক্ষছায়ে মিলিয়ে গেছে। ঝিঁঝির সুরে ঝঙ্কারিত সেই হেমন্তের রাত্রি আমার মনে অপরূপ ভাব এনে দিল। সারা—সারা! এখন কি করছে? হয়ত ঘুমিয়ে নয়ত জেগে আছে। তার মনেও আমার কথা জাগছে—এমনি করে? আমার ভাবনা তাকেও বিচলিত করছে। মোটরের গতি আমার হাতের শৈথিল্যে শিথিল হয়ে এল। মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল, সোজা সারার ওখানে চলে যাই। এমন মধুর নিশীথ, সুন্দর চাঁদের হাসি, আকাশ বাতাসে কি এক ব্যাকুলতা! এমনি ক্ষণেও আমার আকুল আহ্বানে সাড়া দিবে না? আমার ব্যর্থ একক নিঃসঙ্গ জীবনের ভার নিতে আপত্তি করবে! কিন্তু কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সাহায্যে ওকে অপহরণ করার প্রবৃত্তি আমার নেই। ও যদি আসে—আমার ভালোবাসা যদি ওকে জয় করে আনতে পারে—এই প্রতীক্ষায় থাকব। সে যে কোনো সুদূর বিলম্বিত দিনেই হোক, তাই আমার ভাগ্য। ধীরে ধীরে আমি বাড়ী ফিরলাম। জীবনে এত একা নিজেকে আর কখন মনে করেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

সপ্তাহান্তে আমি বদলীর জায়গায় চলে গেলুম, যাবার আগে ওকে একখানা চিঠি লিখলাম—

আমি চল্লুম! যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবার কতখানি দুর্ব্বার ইচ্ছা দমন করে গেলাম, তা খোদা জানেন; কিন্তু তোমার মন পাষাণ! তুমি তা বুঝবে না, অথবা যে দিন তা বুঝবে সে দিন আর এই আজকের সহজ আনন্দের স্বাদ থাকবে না।

তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম আমার জীবনের সমস্ত আগ্রহ, আনন্দ নিয়ে; কিন্তু তুমি শুধু কথার হেঁয়ালি রচে রচে তা থেকে বঞ্চিত রইলে নিজে, রিক্ত করলে আমাকে। তোমাকে ছাড়া জীবনে অন্য কোনো কিছু নিয়ে আনন্দ পাবো সে সম্বল তুমি রাখোনি। তবুও কি জানি কেন সারা প্রাণ মন দিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমারি জয় হোক। যদি তোমার জীবনে কোনো অসাবধান মুহূর্ত্তে আমি প্রবেশ করে থাকি তা হলে নিঃশেষে মুছে যাই; তারি উপর জেগে ওঠো তুমি তোমার নবীন জীবনের গৌরব নিয়ে। আমি বিদায়। আগেও বলেছি, আজো বলছি যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন হয় জানিয়ো। এখান থেকে বেশী দূর গেলাম না, মাত্র আট ঘণ্টার পথ, তবুও মনে হচ্ছে তোমার কাছে থেকে দূরে, বহু দূরে সরিয়ে দিলে তুমিই।

ওখানে পৌঁছে তিন দিনের দিন ওর একখানা চিঠি পেলুম। সে চিঠি আমার কাছে একখানা কাব্য বলেই মনে হল। এতদিন পরেও তার প্রত্যেকটী কথা আমার মনে আছে। তোমাকে সেটা অবিকল লিখে দিচ্ছি। ও লিখেছে—

তোমার চিঠিখানা পেলাম। নিঃস্ব জীবনে খোদার প্রথম মধুর দান—এর আনন্দ আজ আমার সারা জীবনের বেদনা ভুলিয়ে দিল। আমার রিক্ত দিনের পূর্ণ সম্বল এত দিনে আমি পেলাম।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমি যে দিন প্রথম বুঝলুম ভাগ্য আমায় বঞ্চনা করেছে, সংসার আমাকে ঠকিয়েছে, সমাজ আমাকে ত্যাগ করেছে, সে দিন, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে আমার সান্ত্বনা রইল না কিছুতেই। সারা বিশ্বের প্রতি মন আমার বিরূপ হয়ে গেল, বিরাগে ভরে উঠল। জীবনের উপর আমার বিদ্বেষ জন্মাল, সে দিন নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার প্রবল ইচ্ছায় বাধা দিল শুধু আমার প্রতিশোধ নেবার দারুণ প্রবৃত্তি। কিন্তু সে যে অসম্ভব তাও বোঝাবার বন্ধু আমার জুটল না সেদিন। আমি তাই বেঁচে রইলুম। কোনো সাধ্য ছিল না, শুধু রূপ-মুগ্ধ মানুষকে বঞ্চিত করে আমার অন্তরের ব্যথা একটু মাত্র কমত; কিন্তু তার সাধ্যই বা কতটুকু! সে শূন্যতা নিয়েই বা কত দিন থাকা যায়! তাই তুমি এলে আমার অশুভ ক্ষণের, শুভক্ষণের পথ বেয়ে। আমি তোমায় ডাকিনি, চাইনি। তবুও তুমি এলে আমার অন্তর মন ভরে আমার জীবনদাতা, ত্রাতা হয়ে। এলেই তুমি কিন্তু এই অবেলায় রিক্ত নিঃস্ব দারুণ দুর্দ্দিনের পর—সুন্দর সুকুমার পবিত্র তুমি, তোমায় পেয়ে তোমার স্পর্শে জীবন আমার অবলম্বন পেলো—কিন্তু তুমিই আবার যখন হাত পাতলে আমার কাছে—তখন? তখনকার সে রিক্ততার ব্যথা আমার কতখানি বাজল! আমি যে এত রিক্ত এত নিঃস্ব তা কি আমিই জানতুম কোনো দিন? যত প্রার্থীর দল এসেছে দুয়ারে আমার ভিড় করে, পরম উপেক্ষায় তাদেরকে বঞ্চিত করে আমার মন হত শান্ত—কিন্তু তোমাকে যা দেবার জন্য অন্তর আমার ব্যর্থ হাহাকারে ভরে গেল তা আর এই ধরার ধুলার মাঝে কুড়িয়ে পাব না প্রিয়! এই ধরণী যত সুন্দর হোক, মধুর হোক কিন্তু এই সর্ব্বনাশী ধরণী আমার যা হরণ করেছে তা আর ফিরিয়ে দেবে না—তোমাকেও তাই আমি রিক্ত করেই দিলুম

তোমার কাঙ্গালপনা—সে আর সইতে পারি না। ভালোই হয়েছে, ভালোই করেছ। যদি সেই বিদায় মুহূর্ত্তে আমি না সামলাতে পারতুম আমার মনকে—যদিই তোমার সঙ্গের সুখটুকুর লোভ না দমন করতে পারতুম তবে ত তোমার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক জীবনটীকে এক মুহূর্ত্তের ভুলে ভরে দিতাম জন্ম-গ্লানির গ্লানিমায়। তুমি আপোনি ভালো করেছ, বাঁচিয়েছ আমায়। কতবার, কতরূপে আমায় বাঁচালে তুমি।

তোমায় চাই নি আমি, এ তোমার ভুল। এ ভুল ভাঙ্গাবার দরকার ছিল না—না ভাঙ্গলে ভালো হতো কিন্তু তোমার যে চাওয়া, তার বিনিময়ে আমার যা আছে, শুধু বুকভরা ভালোবাসা, তোমার মঙ্গল কামনা—সেইটুকুই যে না দিয়ে আমি পারলুম না। সুদূর উর্দ্ধাকাশে রবি থাকে; তারে আরতি করে শতেক ফুল বিকশিত হয়ে, ধন্য হয়ে যায়। দেহটা যাই হোক—অন্তরের আমার সেই অম্লান অনন্ত ভালোবাসা তোমায় নিবেদন করে আমি ধন্য হলুম। তুমি আমায় চাইলে? এ গৌরব ত আমার কম নয়। অন্তর বাহিরের দৈন্য যে আমার ঘুচে গেল, আর আমার দুঃখ কি! তোমার গৃহলক্ষ্মী হবার যোগ্যতা আমার নেই, সে আমি পারব না—সে কথা তুমি আর বলো না। তুমি মহৎ দাতা সন্দেহ নেই কিন্তু সে দানের ভার বহিবার আমার যোগ্যতা কই? সব জেনে শুনেও তুমি চাইছ আমায় কিন্তু আমি বলছি 'না'—তারই অভিমানে মুখ ফিরিয়ে তুমি চলে গেছ, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো, আজ তোমার আমার ভালোবাসায় কোন বাধা কেউ দিতে পারবে না। এতে কোনো বিভ্রাট নেই, কিন্তু আমাদের পরে যারা আসত, আমাদের ভঙ্গুর আনন্দের পরে, তাদের জীবন হত বিষাক্ত। নয় কি?—আমি ভালো মেয়ে নই—আমার রক্তের ঋণ আমাদের সন্তানরা শোধ করত বুকের রক্ত দিয়ে। সে কি ভীষণ ভাবতেও আমার ভালো লাগে না। তোমার ভালোবাসায় সব অভাব আমার ঘুচে গেছে। কিন্তু তুমি রইলে বঞ্চিত এই ধরণীর ভোগসম্ভার হতে—হয়ত আমাকে নিয়ে তুমি তৃপ্তিই পেতে—কিন্তু একটী ব্যর্থ জীবনের মূল্যে যদি একটী বংশের সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ হয়—আমি বলছি তাও ভালো।

আমাকে তুমি পেতে চাও তোমার সহজ আনন্দ দিয়ে জীবনের সাথী রূপে চিরদিনের জন্য। আমিও তোমায় পেলুম চিরদিনের জন্যই গাঢ়, গভীর, নিবিড় করে। কিন্তু তোমার যা হ'ত অন্তর আনন্দের পরম-বিকাশ আমি তার তৃপ্তি পাবো এই আমার গোপন মধুর ব্যথাভরা স্বপ্ন-কল্পনায়—এ আমার নিজের হাতে গড়া ব্যথা। আমি তোমার সাধ আশা পূর্ণ করতে পারলুম না, আনন্দ, তৃপ্তি দিতে পারলুম না; তাই সারা মন-প্রাণ দিয়ে নিয়ত প্রার্থনা করছি, যেমন আমি তোমার জীবনে ধূমকেতুর মতো উদয় হলুম, ধূলির মতো যেন আবার বিলীন হয়ে যাই!

আমাকে ভুলে যাও তুমি। তোমার যোগ্য সঙ্গিনী, গৃহলক্ষ্মী তোমার জীবন মধুময় করে দিক্—আমি রইলুম তোমার পুষ্পিত জীবনে কাঁটার মতো কুণ্ঠিত হয়ে—তবুও আমি আজ ধন্য। ইতি—

তোমার—সারা।

চিঠিখানার কোনো উত্তর দেই-নি। ইচ্ছা করেই দিলুম না। দেখা যাক, ওর মনের মাধুর্য্য কত দিন থাকে, আর আমারও ভালোবাসার জোর কত খানি, তাই ভেবে; নইলে উত্তর কি দেবার ছিল না? তারপর গ্রীষ্মীর কঠোর তপস্যা-কাল শীত গত হয়ে গেল, বসন্ত এসে ফিরে গেল—গ্রীষ্মের প্রখর দাহ নিয়ে বৈশাখ তার কাল-বৈশাখীর রুদ্র নাচন নিয়ে ধরণীতে ছয় ঋতুর অবদান ছড়াতে নেমে এল। আমি রইলুম সেই পরম ক্ষণের প্রতীক্ষায়।

বদলীতে এসে অবধি শুধু ডাক্তারি ছাড়াও অন্য সব কাজে লেগে গেলাম—না মন, না শরীর কেউ যেন বিশ্রাম পায়। অবসরের অবসন্নতা তখন আমার ভয়ানক যন্ত্রনাকর —একদিন অনেক বেলা অবধি বাইরে বাইরে ঘুরে বাসায় ফিরেছি - নেয়ে খেয়ে আবার হাঁসপাতাল যাব—খেতে বসতেই কি রকম করে হঠাৎ শরীরটা এলিয়ে এলো, ভয়ানক একটা অসুখের আভাষ পেলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রবল জ্বর আমাকে বিছানা নে ওয়াল। বাড়ীতে বাবুর্চি, বয় আর বহুদিনের পুরনো সেই কালু খাঁ খানসামা—কালু যেমন আমার স্নেহ করত, আমার দরদও বুঝত। আমাকে শোওয়া দেখেই হাঁসপাতালে খবর দিলে। সন্ধ্যার পর ডক্তার বাবু ও একজন ছাত্র আমাকে দেখতে এল কিন্তু আমি থাকতে চাই একেলা। কালু তাই ওদেরকে অল্প সময়েই বিদায় করে দিল। পরদিন সকালে অনেকেই অনুগ্রহ করে দেখতে এলেন। এখানে পরিচিত বান্ধব অনেক জুটেছিল কিনা—কিন্তু সত্যি বলছি, তখন তোমার কথা,—সারার কথাই আমার বেশী মনে পড়ছিল—কিন্তু তুমি তখন সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, আর সারা? সে আমার বিশ্ব-ভুবনে অন্তরে বাহিরে রাণীর মতো বিরাজ করছে তবুও কত দূরে!

দুপুরের পর জ্বর আরো বাড়ছে দেখে কালুও ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার সমস্ত সম্বিৎ তখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে—তা জানি না; কিন্তু পরে শুনেছিলাম পাঁচদিন আমি অজ্ঞান ছিলাম। এই ক্ষতিতে যে কি লাভ হল আমার তা শোনো। আমার অন্তরের সেই পরম পাওয়া সম্পর্কে তোমার চোখের সামনে ধরে দিচ্ছি। কি ভাগ্য আমার এই ভোগান্তর পথ ধরে এল।

বিঘ্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন চারিদিক নীরব; রাত বোধ হয় গভীর। অনুভব করলুম, মাথায় বরফ ব্যাগ চাপানো আছে একটু নড়তে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। চোখ মেলতে দেখলুম, নিবিড় রাতে নির্ম্মল জ্যোৎস্না আমার খাটের পাশে লুটিয়ে রয়েছে। তার উপরও নীলাভ মৃদু আলো। ললাটে কার কোমল করস্পর্শ—ভাবলুম নার্স—কত রাত হল জানতে ইচ্ছা হল। কণ্ঠস্বর সরিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকব ভেবেছি—যে শিয়রে ছিল, পাশে এসে নত হয়ে আমাকে দেখছে—মধুর মুহূর্ত্ত—এ সারা—সারাই বটে! একি আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের বিকার কি স্বপ্ন? আমি প্রাণপণে ডাকলুম—সারা! সারা! সারা সাড়া দিলে না, নীরবে লুটিয়ে এল আমার বুকের কাছে। মুখের কাছে ওর ভাষাভরা বাম বাহু আমার গলায় এলিয়ে পড়ল, দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণার দান আমার তপ্ত ললাটে বুলিয়ে দিলে। সেই মধুর মুহূর্ত্তের অস্তিমক্ষণে আমায় সারা প্রাণ মন ভরে উঠল ওর ভালবাসার দানে। মনে হল, আজ আমি পূর্ণ, ধন্য। আর আমার ক্ষোভ নেই, আর আমার ভয় নেই, সফল সার্থক আমার জীবন।

অতীত জীবনের কর্ম্মের পুরস্কার, ভবিষ্যতের পাথেয় আজ থোদা আমাকে এমনি করেই দিলেন। পরম তৃপ্তিতে আমার দুহাত বাড়িয়ে ওর মুখ আমার মুখের উপর চেপে ধরলুম! এত সুখে, এত তৃপ্তিতে আমার চোখ অকারণেই জলে ভরে এলো। সারার চোখও তখন সাত সাগরের লোনা জলের উৎস হয়ে উঠেছে। ওর আর আমার চোখের জলের সে মিলন এক ধারা হয়ে বয়ে নামছে। আমার মনে হল সেই কথা—

"নাহি আর ভয় নাহি সংশয়,
চোখের জলের মিলন টুটিবার নয়॥"

অপূর্ব্ব অনুভূতির গাঢ় তৃপ্তিতে আমার ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত মস্তিষ্ক, ধীরে ধীরে গরম নিশ্চিন্তের ঘুমে ভরে এল—আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন ভোরে আমি প্রথমেই প্রত্যাশিত নয়নে সারাকে দেখব বলে চাইলুম—কিন্তু কোথায় সে! তবে কি সত্যি শুধু স্বপ্ন? আমি চোখ মুছে মাথা তুলতেই কালু এগিয়ে এলো। ওর মুখ উজ্জ্বল। বল্লে 'কেমন লাগছে এখন?' বল্লুম—ভালো, কাল আমার কাছে রাত্রে ছিলে না?' মুখ ধোয়ার টুথটা কাছে আনতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বল্লে—ছিলাম ত আমরা সবাই। মুখ ধুয়ে অর্ধটা খাও—বেলা হয়ে গেছে। বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল—বল্লুম 'মাথা তুলতে পারছি না, পারব না মুখ ধুতে তুই যা।' ও বুঝলে এ রাগের কথা। একটু চুপ করে চলে গেল। আমার তখন সত্যিই কান্না পাচ্ছিল।

একটু পরে দুয়ারের পর্দ্দা নড়ে উঠল এবারে আর ভুল নয়, সত্যিই সারা ঘরে ঢুকল। ক্লান্ত মুখের উপর লজ্জার রক্তিম আভা, ললাটে স্বেদ-বিন্দু। হাতে একটী পেয়ালা—আমার মনে হল সাদী, হাফেজ খৈয়ামের সাকী ইরাণের পথ ভুলে আমার ঘরে এসে উঠেছে! আমার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে ও বল্লে—'সকালে দেখেছি জ্বর নেই, মুখ ধুইয়ে দেই?' আমি শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম—অসীম সুখে ভাষা যেন হারিয়ে গেছে!

এগার দিন ও আমার কাছে ছিল নসীম! সেই এগার দিনের মাধুর্য্য আমার জীবনে ভুলিবার নয়। ও যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি অতর্কিতভাবে চলে গেছল। নয়ত আমি প্রাণ ধরে ওকে বিদায় দিতে পারতুম না সে কথা ঠিক। এইখানে 'তোমার জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে, কি করে ও এল। ও আমি আসবার পর থেকে আমার খবর নিত। ওখানে নাকি এসেও ছিল তিন বার। আমি দেখিনি ও আমাকে দেখে গেছে—একথা ওর কাছেই পরে শুনেছি। আমার জ্বরের তিন দিনের দিন ও এসেছিল। ১১ দিন রইল আমার সংসারে রাণীর মতো আসন জুড়ে, সেবিকার সেবা করে, আমাকে আরো মুগ্ধ লুব্ধ করে। লঘুচ্ছন্দা হরিণীর মতো, কনকণ্ঠা কপোতীর মতো আমার শুষ্ক সংসারে শান্তির বন্যা বইয়ে দিয়ে ও চিরদিনের মতো এঁকে রেখে গেল ওর সত্যিকারের পরিচয়। ও যে কী তার বর্ণনা আজ দেবার চেষ্টা করব না, হয়ত তোমার ভালো নাও লাগতে পারে। ও চলে গেল আমার সমস্ত আনন্দ হরণ করে কিন্তু দিয়ে গেল অসীম তৃপ্তি, সেই তৃপ্তি নিয়ে আমি আজো বিভোর আছি—এর পরও মাঝে মাঝে ওর কাছে গেছি কিন্তু আমার কাছ থেকে সেই দূরত্ব রক্ষা করেই চলেছে। ও আমার সত্যিকার আপন, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু ওর আর আমার ব্যবধান যেন নদীর দুই তীরের মতোই। গভীর জলের ভিতর দিয়ে দেখা যায়, একই মাটীর বুকে বয়ে চলেছে নদীর স্রোত—মাটীরই বুক দ্বিধা করে —দুই তীর এর পানে ও চেয়ে আছে ব্যাকুল হয়ে। তার বুকে শ্যামশোভার অন্ত নেই, তৃপ্তির কমি নেই, তবুও ওরা পরস্পর

থেকে দূরে। আমি আর সারাও অমনি এক প্রীতি-নদীর দুই তীর। জানি না, কোন সুদূর প্রলয়ের দিনে আমরা এক হয়ে যাব—আমি আর ও ভিন্ন বলে কোনো সংজ্ঞা থাকবে না। সারা আজ খুশীতে আনন্দে আছে, শুধু মাত্র আমাদের ভালোবাসার আদান প্রদানেই—কিন্তু আমার মন র'য়ে র'য়ে ওকে আরো নিবিড় করে পাবার জন্য কেঁদে ওঠে! কী জানি হয়ত ওর মতো ভালোবাসতে আমি পারিনি, আমার ভালোবাসায় অত জোর নেই, তাই মনটা মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে আসে সাথীর জন্য। ওকে এই কথা জানাতেই ও বলেছিল এবারে একটা বিয়ে কর। ও সত্যি করে কেঁদে কেটে মিনতি করেই বলেছিল বিয়ে করতে কিন্তু আমি তোমা'কে ঠাট্টা করেই বলেছিলুম—'এবারে একটা বিয়ে করব'—তাতে তুমি যা কাণ্ড বাধিয়ে তুললে, অগত্যা আমি পালাতে বাধ্য হলুম!

তোমার হারানো প্রীতিপ্রার্থী—

আজম।

—:*:—

"আহুতি"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিনে দিনে পলে পলে যা হয়েছে শুধু জমা করা,
একটী মুহূর্ত্তে শেষ তার,
নিষ্ঠুর, জানিনে আগে চিত্ত তব নিষ্ঠুরতা ভরা
আলো নাই—শুধু অন্ধকার।
দয়াহীন লুণ্ঠনের শেষ-চিহ্ন শুধু দেখা যায়,
শুধু ভস্ম—শুধু ভস্মসার,
মাটির পুতুল গড়ি' খেলে ফেলে গেলে পুনরায়
রেখে গেলে শুধু হাহাকার!

খেলা কি হয়েছে শেষ, হে বিজয়ী, হে মোর সম্রাট,
সাম্রাজ্য লভেছ বাহুবলে,
আপনার শক্তিবলে স্থান তুমি লভেছ বিরাট,
স্থাপিয়াছ আপনারে তুমি নানা ছলে।
যে পথে চলেছ তুমি উন্মত্ত সদর্প পদভরে,
সে পথ উঠেছে জ্বলে দেখি,
পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, এক হয়ে গেল চিরতরে,
চমকিয়া চেয়ে দেখি একি?

অনন্ত তমিস্রা ঘোর জেগে থাকে যেথা চিরন্তন,
আলোটীও নাহি যায় দেখা,
সেইখানে যেতে হবে, পথশ্রান্ত—না চলে চরণ,
কেমনে চলিব আমি একা?
হে নিষ্ঠুর, হে সম্রাট, আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে
ফেলে গেলে বিস্মৃতির পারে,
দীর্ঘ পথ না ফুরায়, কে মোরে দেখাবে আলো দিয়ে,
আমি ডেকে ফিরি হেথা কারে?

একটী মুহূর্ত্ত মাত্র, হে নিষ্ঠুর, পাষাণ-দেবতা,
মোরে তুমি নিঃস্ব করে দিয়ে,
সরে গেলে, পশিল না কানে তব মোর কোন কথা,
দস্যু সম গেলে লুটে নিয়ে।
পলে পলে, তিলে তিলে রেখেছিনু যাহা করি জমা,
নিঃশেষে সকলি তুমি নিলে,
তবু ডেকে বলি—ওগো প্রিয়তম, করো করো ক্ষমা,
সব নিয়ে আমারে কি দিলে?

নিষ্ঠুর পায়ের চিহ্ন থাক মোর হৃদয়েতে আঁকা,
শূন্য হয়ে থাকি ধরাতলে,
হোক দুঃখ তবু তাহা থাক চির অনুরাগে মাখা,
হাসি তবু—ভাসি আঁখিজলে।
ভস্ম হয়ে থাকি যদি জানি তবু আছে সার্থকতা,
সার হয়ে করি উপকার,
আমার মনেতে তবু চিরকাল থাকিবে সে কথা,
প্রিয়তম - উপাস্য আমার।

—:*:—

হার হাইনেস ভূপালের বেগম সাহেবা ও তাঁহার কন্যাদ্বয়
ইঁহারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তথাকার নারী-প্রগতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

রুশিয়ার নারী

সোভিয়েট রুশিয়া এক নূতন জগৎ, এক নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। রক্ষণশীল, প্রাচীন দুনিয়ার সাথে রুশীয় আদর্শের কোন মিল নেই দেখে, বিশেষতঃ সুবিধাপ্রাপ্তদের অধিকার ক্রমশঃ ভেঙ্গে যেতে দেখে সাম্রাজ্যবাদীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আর তার স্বরে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্য্যও চালাচ্ছে। রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সাম্রাজ্য-

ষ্টালিনের জননী

এই মহৎ প্রকৃতি নারীর সযত্ন প্রতিপালনেই রুশ রাষ্ট্র-নায়কের ভবিষৎ জীবন গড়িয়া উঠে।

বাদীদের বিরুদ্ধেই বিশেষরূপে পরিকল্পিত বলে রুশিয়ার এই পরিকল্পনা বা মোসাবিদা বিফল হয়েছে বলেও বহুৎ গুজব শুনা যাচ্ছে। আসলে কিন্তু রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জয়যুক্তই হয়েছে। রুশিয়া আবার আর একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করছে। সুতরাং রুশিয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুজব রটেছে তা যে অমূলক এবং হিংসা-প্রণোদিত তা বেশ বোঝা যায়।

রুশিয়া যে আপন আদর্শকে ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত কচ্ছে তার প্রমাণও বেশ মিলে। আমাদের দেশের কবি-সম্রাট রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রুশ পরিভ্রমণ করে দেশে এসে যে বিবরণী প্রকাশ করেন তাতে তিনি রুশিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখই হয়েছেন। সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী মনীষি রোমাঁ রোলাঁ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে রুষ-রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ ষ্টালিনকে যে পত্র লিখেছেন তাতে তিনি রুশিয়ার খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে পৃথিবীর প্রকৃত প্রগতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভাগ্যের সাথে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। মনীষি-শ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্ণার্ড শ'ও রুশিয়াসম্পর্কে অনুরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। এ সমস্ত দেখে শুনেও কি কারুর মনে রুশিয়ায় বিরুদ্ধে এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারে?

নিখিল দুনিয়ার সবহারাদের পক্ষে বিশেষতঃ মেয়েদের উন্নয়নের জন্য রুশিয়া যা করেছে জগতে তার তুলনা নাই। মেয়ে-পুরুষের সম অধিকার কেবলমাত্র সরকারী আইনের কেতাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি। রুশিয়ায় এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে, অফিসে, দোকান ঘরে মেয়েমজুর, মেয়ে চাষী বা মেয়ে কেরাণী ত নিয়োগ করা হয়েছেই এমন কি, আদালতে বিচারপতির কাজে, এবং প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভার সভ্যপদে পর্য্যন্ত মেয়েদের নিয়োগ করা হয়েছে। মোট কথা, রাষ্ট্রে বা সমাজ-জীবনে এমন কোন পদ

নাই যেখানে নারীর সহযোগিতার কোনরূপ অভাব দেখা যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনে রুশীয় নারী যে কতদূর অগ্রবর্ত্তিনী তা নীচের অঙ্কগুলার প্রতি চোখ বুলালেই বেশ বুঝা যাবে। রুশিয়া বর্ত্তমানে কতকগুলি সোভিয়েটে বিভক্ত এই সমস্ত সোভিয়েটের নির্ব্বাচন-অফিসে প্রায় দুই হাজার নারী নিযুক্ত আছে। স্বাস্থ্য, রাজস্ব-সংগ্রহ, সমাজ-বীমা, পুস্তকাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ক সাবকমিটী, কমিশন ইত্যাদিতে আরও হাজার হাজার নারী কর্ম্মী মোতায়েন দেখা যায়। গ্রাম্য সোভিয়েট, প্রাদেশিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি, অল ইউনিয়ন কংগ্রেস ইত্যাদিতে নারীপ্রতিনিধির সংখ্যা বছর বছরই বেড়ে যাচ্ছে। এমন কি কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে পর্য্যন্ত স্থায়ী নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ত্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টি নামক রাজনৈতিক দলটীর উপরই রুশিয়ার সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি নিয়োজিত। এই দলের এক-পঞ্চমাংশের অধিক সদস্য নারী; নগর সোভিয়েটগুলার নারী-সদস্যও মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশ। আবার কেন্দ্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যদের মধ্যেও একঅষ্টমাংশ কেবলমাত্র তথাকথিত অবলা নারী। সুতরাং অক্টোবর বিপ্লবের পর রুশীয় নারী এক নূতন জগতেই বাস করছে।

রুশিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হয়েছে; শিক্ষাবিষয়ে মেয়েদের পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী দেখা যায়। সাধারণ সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্তই মেয়েরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। রুশিয়ার মেয়েদের পক্ষে আর একটা আশার কথা এই যে, শিক্ষা-দীক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা পটের পুতুল, বিলাসিনী হয়ে উঠেনি। রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে তারা সজাগ। কোন মেয়েকে বিলাসিতা করতে দেখলে পুলিস তদনই খোঁজ নিয়ে দেখবে কে এর স্বামী। এরূপ স্বামীকে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড প্রদানও করা হয়।

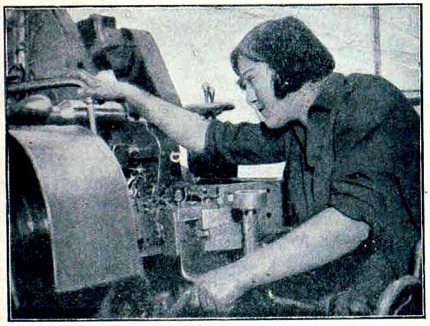

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর সহযোগিতা
রুশিয়ার একজন নারী-শ্রমিক ষ্ট্যালিনগ্রাড শহরের কলের লাঙ্গল তৈরীর বিরাট কারখানায় যন্ত্র পরিচালন করিতেছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্র শিশুদের সম্পর্কে বড়ই হুঁসিয়ার। শিশুদের মঙ্গল বিধানের জন্য রুশিয়ায় যেমন বন্দোবস্ত আছে দুনিয়ার তথাকথিত অগ্রগামী দেশগুলায় পর্য্যন্ত তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মজুর মেয়েদের শিশুসন্তানদের জন্য বহু শিশুনিবাস স্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রই এই শিশু-নিবাসগুলার প্রধান তত্ত্বাধারক। সন্ধ্যায় কারখানা থেকে ফিরবার সময় শিশুনিবাস হ'তে মা তার ছেলেদের নিয়ে বাসগৃহে উপস্থিত হয়। গর্ভবতী মেয়ে মজুরদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ত্তমানে অনেক রাষ্ট্র মেয়ে কর্ম্মচারীদিগকে কুমারী থাকতে বাধ্য করে; কারণ বিবাহিত মেয়েদের নিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়—বিশেষ করে গর্ভবতী মেয়েদের বহুকাল অকেজো হয়ে থাকতে হয় বলে। সোভিয়েট রুশিয়া কিন্তু এসম্বন্ধে নারীদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার দেখিয়েছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের জন্য রাষ্ট্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তিন মাস, এবং পরে তিন মাস—মোট ছয় মাস বেতন সহ ছুটী মঞ্জুর করে থাকে। গর্ভবতী অবস্থায় ইহাদিগকে নানা প্রকার ঔষধপত্রও বিনামূল্যে দেওয়া হয়, এবং প্রসবের সময়ও রাষ্ট্রনিযুক্ত নার্স প্রভৃতি তাদের সেবা করে থাকে।

রুশীয় নারী কংগ্রেসের দুইজন গ্রাম্য প্রতিনিধি

বিবাহ ব্যাপারেও নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে পুরুষ কিম্বা নারী যে কেহ ইচ্ছা করলেই বিবাহ নাকচ হ'তে পারে। কোন কিছু অসুবিধা নাই। সটান আদালতে গিয়ে হাজির হলেই হ'ল। একখানা লিখিত দরখাস্ত পেশ করার পর স্বামী স্ত্রী উভয়ে নাম সহি করলেই সমস্ত আপদ চুকে যায়। অনেক সময় অন্য পক্ষের উপস্থিতিরও দরকার হয় না। একপক্ষ অভিযোগ উত্থাপন করলেই যথেষ্ট।

কেবলমাত্র প্রকৃত ইউরোপীয় রুশিয়াতেই যে নারীদের অবস্থা উন্নত হয়েছে তা'নয়; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এসিয়ার অনগ্রসর দেশগুলায় পর্য্যন্ত নারী-প্রগতির সুবাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। উজবেক, কিরঘিজ, তাতার প্রভৃতি অনগ্রসর জাতের মেয়েদেরও ঘোমটা খসে গেছে,—তারা আর অন্তঃপুরে আবদ্ধ নয়। এরা এখন কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে কাজ ত করছেই, এমন কি রাষ্ট্রের কাজেও যোগদান করেছে। সহ-শিক্ষা-পদ্ধতিও এসমস্ত জাতের মধ্যে কায়েম করা হয়েছে। প্রাচীন-পন্থীরা এবং সুবিধাপ্রাপ্তরা অবশ্যই অনেক বাদ-প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু কমিউনিষ্টদের কঠোরতার মুখে কিছুই টিঁকতে পারেনি।

মোটের উপর, রুশদেশে নারীর যতখানি উন্নত

হয়েছে এমন আর কোন দেশে, কোন যুগেই সম্ভব-পর হয়নি। সামাজিক এবং আর্থিক বিষয়ে রুশিয়া নারীকে সকল প্রকার সুবিধা ত দিয়েছেই, এমন কি রাষ্ট্র-পরিচালনেও নারীর নির্দ্দেশ গ্রহণ করতে রুশিয়ার কিছুমাত্র ইতস্ততা নাই। রুশিয়ার রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রাগণ মাঝে মাঝে মস্কো শহরে নিখিল-রুশিয়া নারী-কংগ্রেস আহ্বান করে মেয়েদের মতামত গ্রহণ করে থাকেন। দুনিয়ার আর কোন দেশেই এপর্য্যন্ত নারীদের মতামতের উপর এতখানি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে বলে জানাযানি।

—:•:—

গান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ওরে ভিন্ গেরামের নাইয়া।
তোমার লাগি জনম গেল
পথের পানে চাইয়া (রে)।

আমি তোমার লাগি তুলে রাখনু
ঝুমকো লতার ফুল,
রঙীন শাড়ী পইর‍্যা বাঁধনু
যতন কইর‍্যা চুল;

আর আঁখির কোলে কাজল দিতে,
জলে গেলরে ধুইয়া।

আমার অনেক সাধের সাধন ধন
অনেক চাওয়ার পাওয়া,
হায়গো আমার পরাণ পাগল
উদাস ফাগুন হাওয়া।

আমি তোমার লাগি' হার গাঁথিলাম
কলঙ্কেরই ফুলে,
পরশ রতন নিধিরে মোর
বক্ষে নিলাম তুলে;

ওরে সেই তুমি না আইলে বন্ধু
মোর, কুলে না' ভিড়াইয়া॥

মিসেস সরোজিনী নাইডু
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ মহিলা; ইঁহার কাব্য-প্রতিভা ও বক্তৃতাশক্তি অনন্যসাধারণ।

আদর্শ মানুষ

কুমারী সকিনা কেরামত বি-এ, বি-এস-সি

বিশ্ব চরাচর বা মানুষের সৃষ্ট কলাশিল্প কোন-খানেই পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠ্‌তে পারেনি। বিশেষতঃ মানুষকে কোনদিনই ত্রুটিহীন অর্থাৎ পূর্ণরূপে দেখা যায় নি। যে যন্ত্রবিজ্ঞান নিয়ে মানুষের এত দম্ভ তাও নিখুঁত হয়েছে কই? এই ত সেদিনও বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন যন্ত্রী বিমানপোতে নিউইয়র্কের গগনচুম্বী হর্ম্মের উপরে উঠতে গিয়ে বিমান শুদ্ধ একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে মানুষ দেখলো, তাই ত, ত্রুটিহীন এমন সব যন্ত্রী তারাও এমন দুর্ব্বল, এত অসহায়!

ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় বেশীদিন টিকে থাকবার অধিকার কারুরই নেই। অভাবগ্রস্ত কিম্বা ছিদ্রান্বেষী দুনিয়ায় মানুষ সব; অন্তঃসার শূন্য বর্ত্তমান সভ্যতার আমলে তারা যেন ভূপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াইতে পারছে না। এরা আবার কেমন করে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে? লক্ষভুক্তা এই মানবজাতি তার অগণিত জাত আর মতবাদ, হাসি-কান্না, দুঃখ দৈন্য, স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার, ইত্যাদি নিয়ে বেদনা-ক্ষত দু'হাত বাড়িয়ে পূর্ণতাকে আঁকড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে। পূর্ণতা কিন্তু প্রাণমাতান বংশীবাদন করে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—নীল নভোমণ্ডলে দেখা যায় তার নর্ত্তনের ক্ষণিক আভাষ, বৃক্ষ-শাখাগ্রে তার গানের সুর বেজে ওঠে, বাতাসের গোঙানিতে যেন তারই ক্ষুব্ধ কান্নাধ্বনি শোনা যায়। দূর হতে দূরান্তরে চলে গিয়ে ও যেন ক্রমাগতই হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—মানুষ! আমাকে যদি চাও তবে আমার অনুসরণ কর।"

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মানুষ পূর্ণতা লাভের জন্য চেষ্টা কচ্ছে। বিলাস-ব্যসন এবং দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে, সাহিত্য, কলাশিল্প, এমন কি ধর্ম্ম এবং নৈতিকতায় পর্য্যন্ত মানুষের চেষ্টা কেমন ক'রে সে ত্রুটিহীন আদর্শে পৌছতে পারে। কিন্তু মানুষ পূর্ণতা কোনদিনই লাভ কর্ত্তে পারেনি। মানুষের সৃষ্ট প্রত্যেক জিনিষও এমনি অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের এইরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেখে লোকের মনে হয়, একমাত্র খোদাতালাই পূর্ণতার অধিকারী। মানুষের মধ্যে যে দাতালার প্রকাশ যতখানি সম্ভবপর হ'য়ে ওঠ, মাত্র ততটুকু পূর্ণতার দাবী মানুষ কর্ত্তে পারে।

এই আংশিক পূর্ণতার ভাগী আদর্শ মানুষের মধ্যে কিন্তু ব্যক্তিত্বটাই সব চেয়ে বড় গুণ। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা কতটুকু হয়েছে এ খুব বড় কথা নয়। যদি তার ব্যক্তিত্ব না থাকে তবে সে পূর্ণতা কোনদিনই লাভ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

অনেকে মনে করে, ব্যক্তিত্ব জিনিষটা দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় এমন কোন গুণ যা মানুষকে অপরের ভয় এবং শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে থাকে। কিন্তু জিনিষটা মোটেই রহস্যময় নয়। ইহা কতকগুলি গুণের সমাবেশ মাত্র, এবং এ সমস্ত গুণের প্রত্যেকটী আয়ত্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ জীবন-ধর্ম্মী অর্থাৎ প্রগতিশীল। অগ্রবর্ত্তিতাই এরূপ মানুষের প্রধান বিশেষত্ব। আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্মসম্মান জ্ঞানও এঁদের প্রখর, এবং দয়াতেও এঁদের মন ভরপুর। এই সমস্ত সদ্‌গুণের প্রাবল্যে অতি সহজেই এঁরা সামাজিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে সমর্থ হন।

নিজেকে যে ভালরূপে জান্‌তে পেরেছে এবং চিন্‌তে পেরেছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই ব্যক্তিত্বের

অধিকারী হ'তে পারে। আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-প্রত্যয়হীন মানুষ মেরুদণ্ডহীন জীবের সামিল। সে কখনও নিজে উঠ্‌তে পারে না, পরকেও দাঁড় করাতে পারে না। আত্মসম্মানবোধও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কম সহায়ক নয়। জীবনের সঙ্কট এবং সন্ধি-মুহূর্ত্ত-গুলিতে এই একটিমাত্র অস্ত্রই তাকে রক্ষা কর্ত্তে এবং এগিয়ে নিতে পারে।

নারীর জন্য যখন মানুষ ত্যাগ স্বীকার করে, বা নিঃসহায় বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করে, তখন মনের মধ্যে এই বৃত্তিটাই (আত্মসম্মানবোধ) জাগ্রত হ'য়ে তাকে পথ দেখিয়ে দেয়। এই একটি মাত্র বৃত্তির বলেই মানুষ মিথ্যা অপযশ এবং অসম্মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেও জীবনের পথে চল্‌তে সমর্থ হয়। জাতি ধর্ম্ম, সামাজিক মর্য্যাদা যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষই আত্মসম্মানজ্ঞান-বিশিষ্ট মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র।

দেখতে গেলে মানুষ এক শ্রেণীর পশু মাত্র; পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে বিবেক বলে একটা বস্তু আছে যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। পাশব প্রবৃত্তিগুলোকে মানুষ এই বিবেকের লগুড়াঘাতেই ক্ষান্ত করে রাখে। মানুষ বিবেকের সহায়তায় ঘৃণাকে ভালবাসায় এবং নিষ্ঠুরতাকে দয়ায় পরিণত করে। কবি দয়াকে মুকুটের চেয়ে মূল্যবান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর এ অত্যন্ত সত্য কথা যে দয়া এবং ভালবাসাই মানুষকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দেয়। দয়াবশতঃই হজরৎ মহম্মদ আরবের অধঃপতিত জাতগুলোকে পাপাচার, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার অতল গহ্বর হ'তে উত্তোলন করতে পেরেছিলেন এমন মহানুভব এবং দয়ালু ইনি ছিলেন যে, মক্কার রাজপথে যখন তিনি বেরুতেন তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে জড়িয়ে ধর্ত্তো। মানুষের উপর তাঁর হৃদ্যভরা দয়া এবং সহানুভূতি ছিল বলেই তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচাতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হজরৎ মহম্মদের মধ্যে দয়াই ছিল সব চেয়ে বড় গুণ।

ভাব-প্রবণতা বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে বটে, কিন্তু মনের মধ্যে প্রেম এবং আদর্শনিষ্ঠা এনে দেয়। তাই বলে হৃদয়তন্ত্রীতে সামান্য একটু সুর বেজে উঠ্‌লেই যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে হবে তার কোন মানে নেই; পূর্ণতার আদর্শে যদি পৌছ্‌তে হয়, তা'হলে সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখা বিশেষরূপে আয়ত্ত করে নিতে হ'বে; এজন্য মনে গ্রহণ করবার শক্তি খুব বেশী চাই; সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধিটাও এমন পরিষ্কার থাকা চাই যাতে ক'রে মন তুচ্ছ সংস্কারগুলো বাদ দিয়ে সত্য এবং সুন্দরকেই বরণ করে নিতে পারে। এমন হতভাগা মূর্খ অনেক আছে যারা "হেসে গুও দুদিন বই ত নয়" নীতি গ্রহণ করে প্রবৃত্তির প্রত্যেক তাড়নাতেই ইন্ধন যোগাতে চেষ্টা করে। এরূপ লোক কোন দিনই মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে পারে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, সমাজের শ্রদ্ধা বা অনুগ্রহ লাভের কি দরকার? সমাজের জন্য মানুষ কেন কামনা-বাসনা ত্যাগ কর্ব্বে? আর সাধু বা আদর্শ মানুষরূপে খ্যাতি পাওয়ার আশায় মানুষ কেনই বা আপনাকে আনন্দ উপভোগ হ'তে বঞ্চিত কর্ব্বে?

এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ—মনের উপর জয়লাভ নয়, সত্যে পৌছতে হ'বে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মানুষ কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রে বাঁচতে পারে না। মানুষের মধ্যে সূক্ষ্মতর এবং মহত্তর এমন কিছু আছে যার বাণী মেনে চলার উপরই চরিত্রের মহত্ত্ব নির্ভর করে। এই মেনে চলাকেই ধর্ম্ম বা নৈতিকতা বলা হয়। পূর্ণতা, আত্মশুদ্ধি এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ দ্বারাই মানুষ জীব-জানোয়ার হ'তে পৃথক হ'তে পেরেছে। মানুষের মধ্যে বড় হওয়ার ইচ্ছাটাই সবচেয়ে বলশালী। অন্য সকলের চেয়ে

বেগম শাহ্ নওয়াজ

ভারতের উদীয়মানা মহিলা রাজনীতিক। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি সুপরিচিতা। বিগত গোলটেবিল বৈঠক এবং জেনিভার জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে অপূর্ব্ব যোগ্যতার সহিত যোগদান করেন। লেখিকা ও বাগ্মীরূপে ইনি পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

আমি বড় হব, এ ধারণাটা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রবল। কিন্তু কেবলমাত্র এই ধারণা হ'লেই ত চলবে না। মানুষকে এর জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। সমস্ত জিনিষ, প্রত্যেকটী ঘটনা, তলিয়ে বুঝতে হবে, দৃশ্য চরাচরের অন্তরালেও যে জগৎ রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এ না কর্ত্তে পারলে বড় হওয়া ত যাবেই না, সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরও ঘোরতর অবিচার করা হ'বে। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে বিবেক, যে প্রজ্ঞার বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত রয়েছে সে-ই মানুষকে পথ দেখাবে আর সুপথ অনুসংধানকারী মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, সহানুভূতি, নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা ইত্যাদি আপনা-আপনি সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

মানুষ পূর্ণ হয়ে জন্মায় না। তার পূর্ণতা নির্ভর করে পূর্ণতা লাভের বাসনার উপর। আর ইহা করতে হলে মানুষকে খোদাতালার নির্দ্দেশিত পথেই চল্‌তে হ'বে, কারণ একমাত্র খোদাতালাই পরিপূর্ণতার অধিকারী।

সংসারের এক কোণে

রাবেয়া খাতুন

সংসারের এক কোণে একেলা বসিয়া নিরজনে
গাহি গান কহি কথা নিশিদিন আপনার মনে।
সময় চলিয়া যায় নাহি তার হিসাব নিকাশ
কভু হাসি কভু কাঁদি কখনো উদাস।
কত কিছু ভাবি আমি কত আশা কত স্বপ্ন গড়ি
নন্দন কাননে ভ্রমি কল্পনার পুষ্পরথে চড়ি'।
ধরার ধূলার স্পর্শে বারবার সংজ্ঞা আসে ফিরে
স্বপ্ন মোর বার বার ভেসে যায় নয়নের নীরে।
তবু স্বপ্ন রচি আমি তবু নিতি গাহি আমি গান
সংসারের এক কোণে একেলা জাগেরে মোর প্রাণ।

আমার প্রাণের সাথে অসীম প্রাণের যোগ-রেখা
অনন্ত জীবন জাগে পৃথিবীর এক কোণে একা।
আমার একটি সুরে অনন্ত প্রাণের সুর বাজে
মহাবিশ্ব মহাব্যোম জাগে মোর একা বক্ষ মাঝে।
অনন্তে হারায়ে যাই আপনার পাইনা উদ্দেশ
কি যে আমি কি মহান্ সীমা নাই—নাই তার শেষ।
আমি যেন মহাকাশ আমি যেন রবি-শশী-তারা
প্রতি অনুপরমাণু মাঝে জাগে মোর প্রাণ-ধারা।
কি যে আমি কিবা চাই তাই বসে ভাবি মনে মনে
অনন্ত স্বপনে মগ্ন আমি একা পৃথিবীর কোণে।

কত ব্যথা কত দুঃখ বক্ষে মোর জাগে নিশিদিন
কিছুতেই নাহি সুখ দিনে দিনে দেহ হয় ক্ষীণ।
কি চাস্? কি চাস্ তুই? মনেরে শুধাই বারবার
ঠিকানা পাইনে ঠিক জবাব পাইনে কিছু তার।
সংসার-সাগর কূলে গড়ি এক বিচিত্র শহর
বেহেস্তের মত চির অপরূপ আনন্দ-সুন্দর।
একটি সমাজ গড়ি মানুষের একটি জীবন
দুঃখ-জরা মৃত্যুহীন আত্মার অমর সিংহাসন।
কল্পনা-উধাও পাখী ব্যর্থ হয়ে আসে ফিরে ফিরে
সংসারের এক কোণে আমি ভাসি নয়নের নীরে।

———

নেপোলিয়নের প্রেমে

রেণুবালা মিত্র বি-এ

১৮০৭ সালের মার্চ্চ মাসের শেষভাগ।

পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার অবস্থিত ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ প্রাসাদের মালিক ভন্ ডোনার নিকট সংবাদ আসিল। সংবাদ আসিল পার্শ্ববর্ত্তী অষ্টারোড্ শহরের রাজকীয় সেনা-নিবাস হইতে। এই বলিয়া সংবাদ আসিল যেন ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ প্রাসাদ অবিলম্বে খালি করিয়া দেওয়া হয়। কেননা, বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রাজকীয় সেনা-নিবাস সেখানে স্থানান্তরিত করিবেন।

ফিন্কেন্‌ষ্টিনে তাড়াহুড়ো পড়িয়া গেল। আবশ্যকীয় মালমাত্তা, জিনিষপত্র গুছানোর ধুম পড়িয়া গেল। মার্চ্চ মাস শেষ হইতে না হইতেই ডোনা পরিবার সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বোনাপার্ট আসিয়া যখন পৌঁছিলেন ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ প্রাসাদ তখন নিস্তব্ধ শুন্‌শান্। কেবলমাত্র একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ছিল গৃহ পর্য্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত। সুন্দর ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ প্রাসাদ, তাহার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ও অভ্যর্থনা-গৃহগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল সেই যুগের সুরুচি-সম্পন্ন সৌন্দর্য্য-বোধ। অষ্টারোড্ শহরের বিশ্রী আবহাওয়া থেকে এই সুন্দর স্থানটিতে আসিয়া বোনাপার্ট বেশ একটু খুশী হইলেন।

ডোনাদের আমলে ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ ছিল যেন নীরব নিস্তব্ধ মরার মত। বোনাপার্টের আগমনে তাহা বেশ সরগরম ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। অশ্বের ঝন্‌ঝনা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, অফিসারদের গাল-গল্প, চাকর-নওকরদের চলাচলে সমস্ত বাড়ীখানা মুখরিত হইয়া উঠিল।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকের একটা ঘটনা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিগন্তে ম্লান হইয়া আসিতেছিল সন্ধ্যার গোলাপী আভা। গাঢ় নীলে মণ্ডিত ছিল বসন্তের আকাশ। সেই সুন্দর সন্ধ্যায় ফিন্কেন্‌ষ্টিন্ প্রাসাদের সুসজ্জিত একটা ঘরের কোণে অবস্থিত চুল্লীর দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। পশ্চাতের দিকে সংবদ্ধ ছিল তাঁহার দুইখানা হাত। উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, দৃঢ় কঠিন বীরত্ব-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, আয়িবর্ষি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ তাঁহার দুই চোখের দৃষ্টি। তাঁহার সম্মুখে একখানা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া লিখিতেছিল একজন অফিসার। মেবিলের উপর রক্ষিত ছিল স্তূপীকৃত কাগজ-পত্র ও যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্রসকল। বোনাপার্ট তাঁহার স্বাভাবিক ছন্দে অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন এবং অফিসারটি প্রাণপণে তাঁহার অনুসরণ করিয়া লিখিয়া যাইতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। পশ্চিম-দিগন্তে মুছিয়া গেল অস্ত রবির শেষ আভাটুকু। হঠাৎ নেপোলিয়ন একবার ঘড়ির পানে কটাক্ষপাত করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট সেক্রেটারীকে চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পরিশ্রান্ত সেক্রেটারী একটা গোপন-দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বোনাপার্ট ধীর পদ-বিক্ষেপে জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের শান্ত নির্ম্মল আকাশের পানে চাহিয়া আপন মনে তিনি বলিলেন: "আজকের এই সুন্দর রাতটা তার আসবার

পথে বেশ উপভোগ্যই হবে।" বলিয়া তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কন্যাষ্ট্যাণ্ট আসিয়া হাজির হইল; বোনাপার্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অনাগত অতিথির জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না। ড্রেসিং-রুম থেকে যে প্রাইভেট সিঁড়িখানা বাগানের দিকে গিয়াছে তাহাতে আলো জ্বালানো হইয়াছে কি না। কেননা, সেই সিঁড়ি বাহিয়াই তিনি আসিবেন। কন্যাষ্ট্যাণ্ট জানাইল যে সব কিছু বন্দোবস্তই ঠিকভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু সম্রাট তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সব কিছু বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি স্বয়ং ষ্টাডি-রুম হইতে বহির্গত হইয়া শয়ন-কক্ষ অতিক্রম করিয়া ড্রেসিং-রুমে গিয়া পৌছিলেন। শয়ন-কক্ষের জরী-জড়োয়া-খচিত চন্দ্রাতপের নীচে স্থাপিত ছিল সুসজ্জিত শয্যা। শয্যার উপরটা আবৃত ছিল লাল ড্যামাস্কের সুন্দর আস্তরণে। সম্রাট ড্রেসিং-রুমে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বস্থ একটী দ্বার খুলিয়া সুন্দর পরিচ্ছন্ন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ করিয়া সেই কক্ষটী সাজানো হইয়াছিল। কাউণ্টেস্ ডোনার যাবতীয় আস্‌বাব-পত্র আনিয়া সেখানে স্থাপন করা হইয়াছিল। বই, ছবি ও সুন্দর ফুলদানিতে করিয়া নানা প্রকার সুরভিযুক্ত কুসুম সকল টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। অনাগত অতিথির জন্য সাজসজ্জার আয়োজনে এতটুকুও ত্রুটি হয় নাই। কনাষ্ট্যাণ্টের কল্যাণে সব কিছুই ঠিকমত সমাধা হইয়াছে। সম্রাট সন্তুষ্টিসূচক মাথা নাড়িয়া পুনরায় ষ্টাডি-রুমে চলিয়া গেলেন। অনাগত অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় ষ্টাডি-রুমের মধ্যে উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি পদচারনা করিতে লাগিলেন।

বসন্তের শিশির-সিক্ত সবুজ পথ বাহিয়া ধীর মন্থর গতিতে আসিতেছিল একখানা গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে পাশাপাশি বসিয়াছিল দুইজন যাত্রী—একজন যুবতী ও একজন যুবক। তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে তাহারা ভাইভগ্নী। গাড়ী চলিতেছিল। যুবক-যুবতীদ্বয় নীরবে বাহিরের পানে চাহিয়া আবছা অন্ধকারে ঢাকা পথপার্শ্বের দৃশ্যগুলি দেখিতেছিল। ক্ষীণ কোমল ছিল যুবতীর দেহখানা: করুণামণ্ডিত মুখখানা—স্বপ্ন-বিজড়িত নীল তাহার দুইটী চোখ। ওয়ার-সো নামক স্থান থেকে তাহারা আসিতেছিল। যুবতীর নাম ছিল কাউণ্টেস্ মেরী কলোনা ওয়ালেস্কা।

মেরী চলিয়াছিল ইউরোপের অসামান্য-প্রতিভা সম্রাট নেপোলিয়নের সন্নিধানে। পথে চলিতে চলিতে আজ নানা কথাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। সেই প্রথম যেদিন নেপোলিয়নের সহিত দেখা হয়। ক্ষুদ্র পলিশ শহর ব্রোনী। বিজয়ী সম্রাট অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছিলেন শহরের পথ দিয়া। কুতূহলী মেরী পথের পাশে দাঁড়াইয়া সম্রাটকে দেখিতেছিল। সহসা সম্রাটের দৃষ্টি নিপতিত হইলো মেরীর সুন্দর মুখের পানে, তাঁহার তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টি মেরীর অন্তস্থল স্পর্শ করিল। মুগ্ধা মেরী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্রাট তাঁহার হস্তস্থিত ফুল মেরীর পানে ছুড়িয়া দিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। তারপর ওয়ার-সো রাজ-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত নৃত্যের মজ্‌লীসে সম্রাটের সহিত তাহার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। সম্রাটের সম্মুখে মেরী যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত ও উদাসীন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সম্রাট বাহিরে কোন প্রকার আগ্রহ বা চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। কেবল মেরীর সুপরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দুই একটী মন্তব্য করিলেন মাত্র। কিন্তু, সকলে দেখিলেন যে সম্রাটের চোখ দুটী নিবদ্ধ রহিয়াছে মেরীর মুখের পনে। মেরীর ঔদাসীন্য যেন সম্রাটের

কোচবিহারের মহারাণী

কোচবিহারের এই উচ্চশিক্ষিত মহারাণী বহুবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। আধুনিক নারী-সভ্যতার অগ্রদূতীরূপে দেশ-বিদেশের নারী সমাজের সর্ব্বত্র ইনি সম্মানিতা হইয়াছেন।

অন্তরের আদিম আকাঙ্ক্ষাটাকে ঘা দিয়া জাগাইয়া তুলিল। ইচ্ছা করিলে একটী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যাহার চরণ-প্রান্তে আসিয়া সমস্ত রমণীকুল লুটাইয়া পড়িত। একটা ক্ষুদ্র বিলাসের সামগ্রীর চাইতে রমণীদের মূল্য যিনি কোনদিন বেশী বলিয়া মনে করিতেন না—সেই বোনাপার্ট কিনা আজ উপেক্ষিত হইলেন একজন অতি সামান্য পলিশ কাউন্টেসের দ্বারা।

মেরী ছিল বৃদ্ধ কাউন্ট এনাষ্টেজ কলোনা ওয়ালেস্কীর যুবতী পত্নী। বয়সের দিক দিয়ে সে ছিল কাউন্ট এনাষ্টেজের নাতিনীর তুল্য। এই প্রকার অশোভন দাম্পত্য-বন্ধনের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল মেরীদের পারিবারিক দুরবস্থা। মেরীকে বৃদ্ধ কাউন্টের কাছে সমর্পণ করিয়া তাহার মা চাহিয়াছিলেন তাহাদের নষ্ট-গৌরব ফিরাইয়া আনিতে। কিন্তু মেরী তাহার জন্য এতটুকুও অনুযোগ কোনদিন করে নাই, নীরবে শান্ত চিত্তে সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীর বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর থেকে আরম্ভ হইল মেরীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়। তাহার মা আসিয়া ধরিল কাউন্ট ওয়ালেস্কীকে যে নেপোলিয়ন যখন ওয়ার-সোতে আসিবেন তখন মেরীকে সেখানে লইয়া যাইতে হইবে। কাউন্ট তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। কেননা, ওয়ার-সোতে গ্র্যাণ্ড ডাচির প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীরা আশা করিতেছিল সমস্ত বিচ্ছিন্ন পোলাণ্ডকে একটা অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করার। কাউন্ট ওয়ালেস্কী ভাবিলেন তাঁহাদের সেই স্বপ্ন বুঝি সফল হইবার সময় আসিয়াছে। সুতরাং নেপোলিয়নকে যেমন করিয়াই হোক তুষ্ট করিয়া কাজ উদ্ধার করিতে হইবে। শক্তিমান নেপোলিয়ন তো অনেক দেশই জয় করিয়াছেন। ক্ষুদ্র পোলাণ্ড রাজ্যটা তাঁহার কাছে এমন কি বেশী মূল্যবান?

যেদিন রাত্রে নৃত্যের মজলীসে নেপোলিয়নের সঙ্গে মেরীর দেখা হইল, তার পর দিন ভোর বেলা মেরীর কাছে একখানা চিঠি আসিল। চিঠি আসিল প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নিকট হইতে। সেই চিঠি আসার পর থেকে মেরীর আর শান্তি রহিল না। একদিকে তাহার মা ও অন্য দিক একে একে সমস্ত পলিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া পড়িল। তাহাদের নেতা প্রিন্স জোসেফ বলিলেন: "সমস্ত জাতির স্বাধীনতা যেখানে নির্ভর করছে সেখানে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে ম্যাদাম। যেমন করেই হোক জাতিকে তো বাঁচাতে হবে।" মেরী প্রথমে অসম্মত হইল। তারপর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর সে স্বীকৃত হইল।

সেই কথা মনে করিতে আজও তাহার সমস্ত শরীরে একটা শীতল শিহরণ বহিয়া যায়। সেই যেদিন এক সন্ধ্যায় ওয়ারসো প্রাসাদের এক কক্ষে গোপনে নেপোলিয়নের সঙ্গে সে মিলিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সেই তীব্র অনুরাগ মিশ্রিত প্রণয়ের দাবী। তারপর সেই বিরাট শক্তির কাছে আত্ম-নিবেদন। তারপর চুম্বন, আলিঙ্গন-পাশ। এমনি করিয়া প্রতিদিন। কিন্তু, সেদিন নেপোলিয়নের বাহু পাশে আবদ্ধ থাকিয়াও নেপোলিয়নের দিকে তাহার মন কোনদিন লিপ্ত ছিল না। সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সে দেখিয়াছে তাহার দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ভাবিয়াছিল এ বুঝি তাহার ভাগ্য বিধাতারই নির্দ্দেশ! যে দেশের জন্য সে আপনাকে এমনি বিকী করিয়া দিবে। মেরীর প্রতি নেপোলিয়নের অনুরাগ যদিও দিন দিন বাড়িয়া চলিল, কিন্তু তবু তিনি তাহার ভালোবাসাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তবে তাহার ঔদাসীন্যের বাঁধটা শেষে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইলেন বটে। তারপর যখন বিদায়ের সময় আসিল নেপোলিয়ন তখন ধরিয়া বসিল যে মেরীকে তাহার সঙ্গে প্যারিসে গিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু মেরী সেই প্রস্তাবে

কিছুতেই সম্মত হইল না। সে জানাইল যে ওয়েলওয়াইস্-এ তাহার স্বামীর বাড়ীতে গিয়াই সে থাকিবে। এবং সেখানে সে ভগবানের প্রার্থনা করিয়া কাটাইবে। নেপোলিয়ন কিছুটা ব্যথিত হইয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ করুণ কণ্ঠে বলিল—"আমি জানি আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে। আমি জানি তোমার মনের কোণে আমার কোন স্থান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জানি তুমি কত ভালো, কত সুন্দর। তা সত্ত্বেও আমি জানি তোমার হৃদয় কত পবিত্র, কত উদার। আমার কর্ম্ম মুখরিত জীবনের যে মুহূর্ত্তকটি তুমি আনন্দে পূর্ণ করে দিলে। হাঁ একমাত্র তুমিই দিতে পারলে। এ-ও কি সম্ভব যে তুমি সেই আনন্দের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে চাও? সেই স্মৃতিটুকু থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চাও? হায় লোকে মনে করে পৃথিবীতে বুঝি সব চাইতে সুখী মানুষ আমি।" বলিয়া তিনি এমনি করুণ হাসি হাসিলেন যে মেরীকে তাহা বড় আঘাত দিল। তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গেছে। নেপোলিয়ন আবার প্রুসিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখানে আসিয়াই সে মেরীকে খবর পাঠাইয়াছেন যে সে নিজেকে বড় একা একা বলিয়া অনুভব করিতেছেন সুতরাং মেরী যেন অবিলম্বে চলিয়া আসে। মেরী ভাবিল এই বুঝি তাহার সঙ্কল্প সাধনের উপযুক্ত সময়। সম্প্রতি নেপোলিয়ন একটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই মন বেশ শান্ত আছে। সুতরাং এই সময়ে মেরী যদি তাহার দেশের স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করে হয়তো বা তাহা সফল হইতে পারে। মেরী তাহার সহোদর ল্যাজিনিস্কীকে সঙ্গে লইয়া নেপোলিয়ন সন্নিধানে যাত্রা করিল।

মৃদু বেগে চলন্ত অশ্ব-যানের মধ্যে বসিয়া মেরী এতক্ষণ অতীতের সেই ঘটনাগুলির কথা ভাবিতেছিল। হঠাৎ একস্থানে গাড়ীখানা থামিয়া পড়িতেই মেরী চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল তাহারা ফিঞ্চেনষ্টিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফিঞ্চেনষ্টিন্ প্রাসাদের প্রশস্ত তোরণ দ্বার, সাবধান প্রহরায় নিযুক্ত শাস্ত্রীর দল, ল্যাজিনিস্কীর সাঙ্কেতিক শব্দ। তারপর প্রাসাদের ছোট একটী দরজার সামনে দেখিতে পাইল রূপার ঝাড়বাতি হাতে দাঁড়াইয়া আছে কনাষ্টাণ্ট। তাহারা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। তারপর কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে সে যাহার মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলো তিনি প্রবল পরাক্রান্ত নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন বলিলেন—"মেরী!"

মেরী কোন জওয়ার দিল না। তাহার সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন সে অনুভব করিল একটা ভয়-মিশ্রিত গোপন আকর্ষণ।

ফিঞ্চেনষ্টিনের নির্জ্জন এক কক্ষে মেরীর দিন কাটিতে লাগিল। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কখনও সে বই পড়িত, কখনও বা সেলাই লইয়া বসিত। কিন্তু হাতের বই হয়তো কোলের উপর পড়িয়া থাকিত, সেলাইয়ের সূচিকা হয়তো অলসভাবে হাতের মধ্যেই ধরা থাকিত। উদাস মেরী শূন্য মনে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত, হয়তো সে স্বপ্ন দেখিত ওয়ার-সো পুনরায় একটা স্বাধীন শহরে পরিণত হইয়াছে। দল বাঁধিয়া পলিশ সৈন্যগণ পথে পথে কুচকাওয়াজ করিতেছে। মুখে মুখে চারিদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে স্বাধীনতার সঙ্গীত। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিত।

তারপর রাত্রি যখন গভীর হইয়া আসিত তখন নেপোলিয়নের সমভিব্যাহারে সে গৃহ হইতে বাহির হইত। জ্যোছনা উজল শুব্ধ নিশীথ-প্রকৃতি। লেকের উপর বন্য হাঁসের দল উড়িয়া বেড়াইত। থাকিয়া থাকিয়া দূর হইতে নাইটিঙ্গেলের সুমিষ্ট স্বর ভাসিয়া আসিত। লিলাক্ আর কচি বার্চ্ছের গন্ধে ভরা

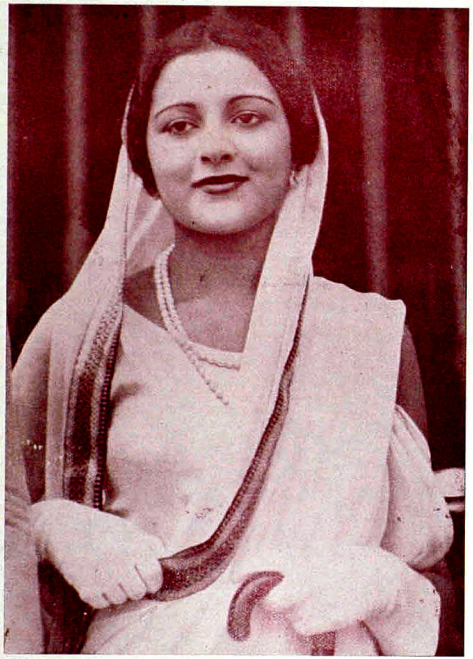

কপূরতলার রাজপুত্র-বধূ

রাজবংশ-সম্ভূতা এই উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ইউরোপের বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। প্রগতিশীল উদার ভাবধারা'র জন্য কপূরতলার রাজ-পরিবার দেশ-বিদেশ সর্বত্রই বিশেষ খ্যাতির অধিকারী।

মৃদু বাতাস আসিয়া তাহাদের পরশ বুলাইয়া যাইত। এমনি করিয়া মেরীর দিন কাটিতে লাগিল।

যতই দিন যাইতে লাগিল নেপোলিয়ন যেন ততই মেরীর পানে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মেরীর একটী কথায় তাঁহার মুখের সমস্ত উদ্বেগ বিরক্তির চিহ্ন মুছিয়া যাইত, তাঁহার সমস্ত ক্রোধ পড়িয়া যাইত। মেরী হইয়া উঠিল তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। নেপোলিয়নের এই একান্ত নির্ভরতা মেরীর মনকে আকর্ষণ করিল। সে যেন তাহাকে ভালোবাসিতে সুরু করিল। তারপর ক্রমে সেই ভালোবাসা এমনই গভীর হইল যে মেরীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তখন একটা গৌণ ব্যাপারে গিয়া দাঁড়াইল মাত্র। এমনি করিয়া ভালোবাসা যখন গাঢ় হইয়া আসিল তখন হঠাৎ একদিন বিদায়ের শানাই বাজিয়া উঠিল। ১৮০৭ সালের মে মাসে নেপোলিয়ন মেরীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যাবার সময় মেরী তাহার স্বীয় হস্তের স্বর্ণ অঙ্গুরীয় খুলিয়া তাহাতে তাহার মাথার সোনার বরণ একগাছা কেশ জড়াইয়া নেপোলিয়নকে প্রদান করিলেন।

তাহার পরের এক শীতের ঋতুতে নেপোলিয়নের আহ্বানে মেরী প্যারিসে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। মেরীর জীবনে তখন নেপোলিয়নের সাহচর্য্য ব্যতীত হয় তো আর কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। সে সমাজে কোথাও বাহির হইত না, কাহারও সাথে বড় একটা মেলামেশা করিত না! কেবল একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকিত যে নেপোলিয়ন কখন তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ছিল তাহার ভালবাসা সেই ভালোবাসার বিনিময়ে সে কিছু পাইবে—এই আকাঙ্ক্ষা যেন একেবারেই মুছিয়া গেল তাহার হৃদয় থেকে। মেরী ছায়ার ন্যায় সম্রাটের অনুসরণ করিতে লাগিল। তারপর প্যারিস হইতে অষ্ট্রিয়া। সেই কত অনুরাগ মিশ্রিত নিত্যকার মেলামেশা। কত চুম্বন, কত আলিঙ্গন কত ছন্দে কত ভাবে দুইটি হৃদয়ের প্রেমালাপ। তারপর আবার বিদায়। মেরি চলিয়া গেল তাহার দেশে—নেপোলিয়ন তাহার প্যারিসের রাজধানীতে।

নেপোলিয়ন তাঁহার ভ্রাতা লুইসের শিশু পুত্র চার্লস নেপোলিয়নকে মনোনীত করিয়াছিলেন তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই শিশুটী গিয়াছিল মরিয়া। এবং এদিকে অনেকদিন কাটিয়া গেল তবু তাঁহার পত্নী জোসেফাইনের গর্ভে কোন পুত্র সন্তান জন্মিল না। সুতরাং প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে, জোসেফাইনকে বর্জ্জন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবেন। কাজেও তাহাই হইল। তিনি বিবাহ করিলেন অষ্ট্রিয়া সম্রাটের কন্যা আর্কডাচেস্ মেরী লুইসকে। এই বিবাহের এক মাস পরে খবর আসিল নেপোলিয়নের ঔরসে মেরী ওয়ালেস্কার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে।

এই ঘটনার পরে কাউন্ট ওয়ালেস্কী তাঁহার পত্নী মেরীকে পরিত্যাগ করিলেন। মেরী তাহার ছেলেকে লইয়া প্যারিসে আসিল। নেপোলিয়ন তাঁহার প্রণয়িনী মেরীর ছেলেকে কাউন্ট ওয়ালেস্কী উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার উপযুক্ত ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু মেরীর সেই পুরাতন প্রণয়ের সম্বন্ধটা আর প্রশ্রয় দিলেন না। ক্ষুণ্ণমনা মেরী নীরবে চলিয়া গেল।

মেরী লুইসকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার প্রণয়িনীর কথা বিস্মৃত হইল বটে কিন্তু মহাপ্রাণা মেরী ওয়ালেস্কা তাহার ভালোবাসার অবমাননা কোনদিনই করিতে পারিল না। যে আগুণ তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল তাহা আর নিভিল না। গোপনে একান্ত মনে সে তাহার

প্রেমের পূজা করিতে লাগিল। কোন দুঃখ কোন অনুযোগ সে প্রকাশ করিল না। জীবনের সকল বেদনা সকল ব্যর্থতা সকল উপেক্ষা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া নীরবে সে দিন কাটাইতে লাগিল। কেহ জানিল না কেহ বুঝিলো না—মেরী ওয়ালেস্কার অন্তরে কি দাহ!

শত অবহেলা শত উপেক্ষাও নেপোলিয়নের দিক থেকে মেরীর ভালবাসা ফিরাইতে পারিল না। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরের রাত্রিতে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব নেপোলিয়নকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ভগ্ন-হৃদয় পরিশ্রান্ত নেপোলিয়ন গভীর দুঃখে অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ পান করিলেন। বিষে তাঁহার মৃত্যু হইল না, কিন্তু তিনি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-পরিত্যক্ত নেপোলিয়ানের সেই দুঃখের দিনে মেরী আসিয়া হাজির হইল। সমস্ত মর্ম্ম-যাতনা ভুলিয়া গিয়া স্বেচ্ছায় সে আপন হাতে তুলিয়া লইল নেপোলিয়নের সেবার ভার! কিন্তু তবুও নেপোলিয়নের হৃদয়ে মেরীর স্থান হইল না। তারপর এল্বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন যখন অতি দুঃখে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন সেদিনও এই মেরীই গিয়াছিল তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য কিন্তু পাষাণ-প্রাণ নেপোলিয়ন ফিরিয়া চাহিলেন না। এই ভাবে বার বার উপেক্ষিতা হইয়া মেরীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বঞ্চিতা মেরী শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই ঘটনার পর দীর্ঘ আট বছর কাটিয়া গেছে।

শূন্য ফিঙ্কেনষ্টিন্ প্রাসাদের সম্মুখের বৃহৎ প্রাঙ্গনখানা নিস্তব্ধ নীরব। থাকিয়া থাকিয়া মন্দ বাতাসে কেবল দুলিতেছিল পত্রহীন শূন্য গাছের কচি শাখাগুলি। নাইটিঙ্গেলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর ধ্বনিয়া উঠিতেছে না, দূরে লেকের উপরে বন্য হংসের দল আর উড়িয়া বেড়ায় না। যে সৈন্যদল একদিন এই বাড়ীখানা গুলজার করিয়া তুলিয়াছিল তাহারা হয়তো রাশিয়া, লিপজীগ কিম্বা ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে চিরদিনের জন্য ঘুমাইতেছে। আর সেই মুক্ত আকাশ-চারী ঈগল পক্ষীটির ডানা আজ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আড়ষ্ট দেহ বন্দী ঈগল পাখী সেণ্টহেলেনাতে আজ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা একখানা ভারী অশ্বযান আসিয়া ফিঙ্কেনষ্টীনের প্রধান দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গাড়ী হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলো কালো বোরকায় আবৃত এক রমণী! রমণী প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ঘণ্টা বাজাইতেই একজন বৃদ্ধ ভৃত্য আসিয়া দাড়াইল।

কোমল কণ্ঠে রমণী বলিল: "আমি কি একবার ভিতরে যেতে পারি?"

ভৃত্য বলিল: "না মাদাম! আমার মনিব তো এখন বাড়ীতে নেই।"

রমণী দেখিলেন বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কোন লাভ নাই। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখের আবরণ খানা সরাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে উদার দুইটি নীল চোখ করুণভাবে নিবদ্ধ হইল বৃদ্ধের মুখের পানে। রমণী বলিল: "আমাকে চিনতে না? আট বছর আগে এইখানে আমি একবার এসেছিলুম।"

—"ও...আপনি ম্যাদাম?" বলিয়া ভৃত্য সসম্ভ্রমে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

—"এই বাড়ীর ঘরগুলি আমি একবার দেখতে চাই। সেই পুরাতন-দিনের স্মৃতি-জড়িত ঘরগুলি

আমি আর একবার দেখতে চাই।" দয়া করে 'আমাকে একটু দেখাবে?'

বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত ঘরগুলি সে ঘুরিয়া দেখিল। তারপর নেপোলিয়নের সেই পুরাতন শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া সে ভৃত্যের পানে ফিরিয়া বলিলো: "আমি এখানে একটু একা থাকতে চাই। আমাকে একটু প্রার্থনা করতে হবে। অনুগ্রহ করে তুমি একটু সরে যাও। আমার বেশী দেরী হবে না।" ভৃত্য চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ভৃত্যকে বক্‌সিস দিয়া কাউণ্টেস ওয়ালেস্কা যখন চলিয়া গেছে তখন বৃদ্ধ ভৃত্য সম্রাটের শয়ন-কক্ষে আসিয়া দেখিতে পাইল যে সুসজ্জিত রাজ-পালঙ্ক-আবৃত লাল ড্যামাস্ক কাপড়ের আস্তরণ থেকে চৌকোণ একটা অংশ কে কাটিয়া লইয়া গেছে। কে এই সর্ব্বনাশ করিল? নিশ্চয়ই এই ভদ্র মহিলাটীর কাজ। কি আশ্চর্য্য!

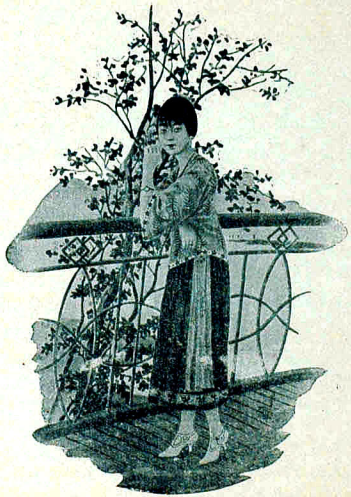

উচ্চশিক্ষিতা আধুনিক চীনা রমণী

তুরস্কের নারী জাগরণ

নারী-প্রগতি সম্বন্ধে বোলশেভিক রুশিয়ার পরই তুরস্কের স্থান। তুর্কী মেয়ে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আজ এত বেশী স্বাধীনতা লাভ করেছে, যা ইউরোপ-আমেরিকার সেরা দেশগুলায়ও সম্ভবপর হ'য়ে উঠে নি।

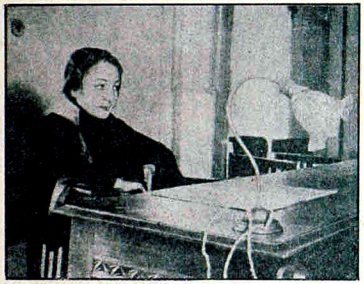

প্রথমতঃ নারীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অর্থোপার্জ্জনের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান আজ তুর্কী-নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত। কলকারখানায় দৈনিক পরিশ্রমের কাজকর্ম্ম হ'তে, বড় বড় সরকারী চাকুরী, আইন-আদালতে পর্য্যন্ত নারীর সমান প্রবেশাধিকার। নারী-ব্যবহারজীব, নারী চিকিৎসক, ত আছেই, আদালতে বিচারকের পদে পর্য্যন্ত নারীকে সমাসীন করা হইয়াছে। সংবাদ-পত্র সেবায়ও তুর্কী নারী অনগ্রসর নয়; বহু মহিলা সম্পাদিকারূপেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তুর্কীদের যোদ্ধা হিসাবে খুব সুনাম আছে। তুর্কী-নারীও অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সমরকুশলতা দেখিয়েছে বিগত স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই সেদিনও যে নারী অন্তঃপুরের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধা ছিল, তারা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৃতিত্ব দেখাবে, তা কেউ ভাবতেও পারে নি।

সাওলাত হিল্মী খানম
তুরস্কের প্রথম মহিলা-জজ

তুরস্কের নারী-প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই স্মরণ-পথে উদিত হয় কামাল আতাতুর্কের কথা। নব্য তুরস্কের তথা যুবক এশিয়ার নারী-জাগরণের তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক। এশিয়ার অনাগত যুগের নারী এই বীর-শ্রেষ্ঠের নাম সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিতই স্মরণ করিবে।

নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমলে নারীর আইনগত এবং সামাজিক মর্য্যাদাও খুব বেড়েছে। বহুবিবাহ এখন অতীতের বিষয়-বস্তুতে পরিণত। যে কোরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে বহুবিবাহ সমর্থিত হয়ে আসছিল, নবীন তুর্কীর কর্ণধারগণ সেই কোরাণ থেকেই বহুবিবাহের পরিপন্থী নীতি খুঁজে বের

করেছেন। রীতিমত আইন করে এখন পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ

মিসেস সা'দ দরবেশ
তুরস্কের পৃথিবী-বিখ্যাত মহিলা কবি।

সম্পর্কেও নারী পুরুষের সম-অধিকার নীতি প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

অল্পদিন হইল, তুর্কী-রাষ্ট্র মেয়েদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তুর্কী জাতিকে ত চমৎকৃত করেছেই এমনকি পশ্চিমের বহু দেশও এখবরে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেছে। নারীর ভোট প্রদানের অধিকার অনেক দেশে প্রবর্ত্তিত হ'লেও, এখনও পাশ্চাত্য বহু দেশের মেয়ে জাতীয় ব্যবস্থা-পারিষদের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে নি। অল্পদিন হ'ল, কামাল আতাতুর্ক নূতন এসম্ব্লিতে সত্তর জন মহিলা ডেপুটীর সমাবেশ করেছেন। এখন তুরস্কের সমগ্র নারীজাতি এসেম্ব্লি অর্থাৎ জাতীয় ব্যবস্থ-পরিষদের ভোটাধিকারও ভোগ করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও আধুনিক তুর্কী নারী খুব বেশী উন্নত। তুরস্কের প্রায় সর্ব্বত্র সহ-শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আর এদেশে ছেলেমেয়ের যে প্রকৃত শিক্ষাই হচ্ছে, তাতে সন্দেহ করবার বিশেষ আবশ্যক নাই। সামান্য কিশোরবয়স্কা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে ভাবে উন্মুক্ত সভায় অনর্গল বক্তৃতা করতে দেখা যায়, তা অনেক দেশের পেশাদার বক্তারও দুঃসাধ্য বলে মনে হয়।

তুরস্কের এই অত্যাশ্চর্য্য নারী-প্রগতি একমাত্র রাষ্ট্রের কল্যাণেই সম্ভবপর হয়েছে। অনগ্রসর

মালেক হানুম

সুলতান আবদুল হামিদের মন্ত্রী মুরী বের কন্যা। ইনি আভিজাত্য, শিক্ষা ও কৃষ্টির অধিকারিণী। তুর্কী নারী-জাগরণের ইতিহাসে ইনি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

নারীদের উন্নয়নের জন্য তুর্কী-রাষ্ট্র অনেক সময় পক্ষপাত নীতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছে। নারীদের জন্য বিশেষ অধিকার, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা'র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হয়েছে। এজন্য তুর্কী-রাষ্ট্র প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে পারে না; কারণ অনগ্রসর, এবং পতিতদের উন্নয়নের এই হচ্ছে সনাতনী রীতি।

ইসমৎ শিরি খানম

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী-সাংবাদিক; বহু ভাষায় ইঁহার অভিজ্ঞতা আছে।

কামাল আতাতুর্ক পাশ্চাত্যের অনুকরণেই তুরস্কে মহিলা-প্রগতি আরম্ভ করেছেন। সকল বিষয়ে তুরস্ককে একটী অগ্রগামী পাশ্চাত্য দেশরূপে গড়ে তুলাই কামাল আতাতুর্কের আকিঞ্চন; সেইজন্য নারীকেও তিনি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করে গড়ে তুলছেন। তাই বলে তুর্কী নারী যে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে তা নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তুরস্কের নারিগণ এখনও ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত, ঘর-সংসারের উপর এখনও এদের সমান আসক্তি। নারী প্রগতির জয়-

মাডাম মিহ্‌রি বাসিম

ইস্তাম্বুল ষ্টেট একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্‌এর (জাতীয় কলাশিল্প শিক্ষালয়) প্রতিষ্ঠাত্রী।

ইস্তাম্বুল শহরে তুর্কী বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করিতেছে।

জয়-কার সত্ত্বেও তুরস্কের পারিবারিক জীবন এখন পর্য্যন্ত সামান্য পরিমাণেও শিথিল হয় নি। বর্ত্তমান সভ্যতার আমলে ইউরোপের নারী ক্রমেই ঘর-সংসার হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। পারিবারিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার সম্মেলন, বোধ হয় তুর্কী নারীই সম্ভব করে তুলে জগৎ-সমক্ষে বিশেষ গৌরবের অধিকারিণী হ'বেন।

মিসেস কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়
ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

মিসেস কে, সি, দে
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ; সমাজ-হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্যা এবং নারী-সমাজের উন্নতির পথ প্রদর্শিকা।

মিসেস হামিদ আলী
ভারতের নারী-সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত বৎসর ইস্তাম্বুল নারী-কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

বেগম শামসুন নাহার বি-এ

আগামী শাসন সংস্কারে এদেশের মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকার করা হইল, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এদেশের মেয়েরা আজকাল জাগিতেছেন—সত্যই ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন উন্নতির রাজপথ বাহিয়া। এই অগ্র চলার পথে একদিকে আশা ও আনন্দ—অন্যদিকে ভয় ও সন্দেহ যখন মনকে দোলা দিচ্ছিল, সে সময়ে এই নূতন শাসনসংস্কার আমাদের জাগরণের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া দিল।

আমাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে শিক্ষা ও সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে আজো আমরা অনেকখানিই পেছনে। শিক্ষার অবস্থাই যেখানে শোচনীয় সেখানে মেয়েরা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হইবেন এমন আশা করা যায় না। আমরাও যে দেশ শাসনের ব্যাপারে নিজেদের অধিকার বা দায়িত্ব সম্বন্ধে একটুও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি এমন বলিতে পারি না। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা পাইয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের অদৃষ্টকে আরো ধন্যবাদ দিই—যখন মনে পড়ে বিলাতের মেয়েদের কথা। সে-দেশের মেয়েদের অবাধ গতিবিধি ও স্বাধীন জীবন হয়ত অনেকের কামনার বস্তু। কিন্তু আশ্চর্য্য হই আমরা—যখন ভাবি, আজ আমরা যাহা অতি সহজে পাইলাম সেইটুকু অধিকারের জন্য ইঁহাদের কি লড়াই-ই না করিতে হইয়াছে। ইঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পাইয়াছেন—ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন—সে বিশ বছরের কথাও নয়।

শিক্ষার আলোকে, স্বাধীনতার আলোকে যে দেশের মেয়েদের হৃদয়-মন আলোকিত হইয়াছিল—আর তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছিল দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি একটা গভীর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞান—নিজ শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতি একটা গভীর বিশ্বাস। ভোটাধিকারের গুরুত্ব তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—ফলে ভিতর হইতে আসিয়াছিল একটা প্রয়োজনের তাগিদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একদল ইংরেজ নরনারী ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে এই আন্দোলন দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। নানাদল নানাভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন। কেহ কেহ আন্দোলন করিয়াছেন বিধিসঙ্গত উপায়ে। দেশের দিকে দিকে সমিতি স্থাপন করা হয়। হাজার হাজার মহিলার স্বাক্ষর নিয়া পার্লামেণ্টে আবেদন পাঠানো হয়। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মেরী কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহিলারাও ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ-সব সভাসমিতি, আবেদন নিবেদন কিছুতেই কিছু ফল হইল না। ইংলণ্ডের নারীর ভোটাধিকার পাইবার কোন আশা দেখা গেল না।

আবার ক্রমে ক্রমে এমন দলও সৃষ্টি হইল যাঁহারা মনে করিলেন আইন অমান্য করিয়া, শান্তিভঙ্গ করিয়া

যে কোন উপায়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা বৃথা। ফলে তাঁহারা সরকারী বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া দেশময় একটা অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। দলে দলে মহিলাদের কারারুদ্ধ করা হয়। সেখানেও তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেন নাই—প্রায়োপবেশন করিয়া এবং আরও নানা উৎপাত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক একবার মনে হইয়াছে বুঝি কার্য্য সিদ্ধি হইল। কিন্তু পার্লামেণ্টে নারীর ভোটাধিকারের বিল কতবার পাশ হইতে হইতেও হইল না। কেন হইল না! কারণ পুরুষেরা মাত্র জনকয়েক ছাড়া আর সকলেই ছিলেন এই আন্দোলনের ঘোর শত্রু। নারী রাষ্ট্রব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাইবেন এই কল্পনাও তাঁহাদের কাছে অসহ্য। আন্দোলনের প্রথম সময় গ্লাডষ্টোন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ সময় লর্ড কার্জ্জন, লর্ড বার্কেনহেড, লর্ড এসকুয়িথ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনৈতিকেরা প্রত্যেকে এই বিলের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অবশেষে জয় হইল। ১৯১৮ সনে ইংলণ্ডের নারী ভোটাধিকার পাইলেন। তারপরে পূর্ণ জয় আসিল ১৯২৮ সনে। এই বৎসরে তাঁহাদিগকে পুরুষের মত একই শর্ত্তে ভোটাধিকার দেওয়া হইল তবে আমরা ভুলিব না—ইহার জন্য দিনের পর দিন তাঁহাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, কত আশা নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। একদিন নয়, দু'দিন নয়—দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর, একটা শতাব্দীর অর্দ্ধেক ইঁহারা লড়াই করিয়াছেন!

ইঁহাদের এই লড়াইয়ের ইতিহাসের দু'একটা বিষয় আমাদের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই নারীর অধিকার কেহ তাঁহাদিগকে হাতে তুলিয়া দেয় নাই। আগাগোড়া নিজের চেষ্টাতেই শত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা আপনাদের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া নিলেন। দ্বিতীয়তঃ—বারে বারে প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হইলেও ইঁহারা একটুও দমেন নাই। যাঁহাদের কাছে থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিয়াছেন হয়ত শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারাও বিরুদ্ধদলে ভিড়িয়াছেন; এমন কি নারী সমাজের মধ্য হইতেও সময় সময় প্রবল বাধা আসিয়াছে। একদল মহিলা সভাসমিতি ইত্যাদি গঠন করিয়া এই আন্দোলনে বাধা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর একমনে একই লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধনাই শেষে জয়যুক্ত হইল। ১৯২৮ সনে ইংলণ্ডের নারী দেশের রাষ্ট্রের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার পাইলেন।

আমাদের সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় এই যে, ইংরেজ মেয়েদের যে অধিকার এত কষ্টে অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল—হতভাগ্য ভারত-নারী এক প্রকার বিনা চেষ্টাতেই সেই অধিকার পাইয়াছেন। অথচ শত শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজ পুরুষেরা ভোটাধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন; রাজা সেখানে রাজত্ব করেন, শাসন করেন না—দেশ শাসন করেন আসলে প্রজারাই। আর আমাদের দেশে পুরুষেরাই সবে শাসন কার্য্যে মতামত প্রকাশ করিবার সামান্য সুযোগ পাইয়াছেন।

এ দেশের মেয়েরা ভোটাধিকার পাইলেন—রাষ্ট্রব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু এখানেই আমাদের সকল কথা ফুরাইল না। এ প্রসঙ্গে বাংলার নারী সমাজের তরফ হইতে দু'একটা কথা বলিবার আছে।

রাজনৈতিক অধিকার নির্ভর করে নানাবিধ যোগ্যতার উপরে। সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যোগ্যতার দিক দিয়া আমরা দেখিতে পাই যে সব পুরুষেরা ভোটাধিকার পাইবেন তাঁহাদের পত্নীরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকার লাভ করিবেন, আর মেয়েদের নিজ নামে

সম্পত্তি থাকিলে তো কথাই নাই। যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকিলে বর্ত্তমানে ভোটাধিকার দেওয়া হয় আগামী শাসন সংস্কার অনুসারে তাহারও পরিমাণ অনেক কম করিয়া দেওয়া হইল।

সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যোগ্যতা ছাড়া অন্য দিক দিয়াও ভোটাধিকার আরো বাড়ানো হইল। যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা ভোটাধিকার পাইবেন তাঁহাদের শিক্ষার গুণেই। কিন্তু বাংলার ও অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় যোগ্যতার মধ্যে একটু তারতম্য দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের মেয়েরা শুধু লিখিতে এবং পড়িতে জানিলেই ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু বাংলা দেশের এবং আর দু'তিনটী প্রদেশের বেলায় এই যোগ্যতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চতর করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে ইঁহারা ম্যাট্রিক পাশ না হইলে ভোট দিতে পারিবেন না। বাংলার মেয়েরা কিন্তু এই ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল সমাজে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী অনেক মেয়ের চেয়ে বেশী উন্নত, অথচ ম্যাট্রিক পরীক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় নাই। এই শ্রেণীর মহিলাদের এমনও কেহ কেহ আছেন—স্ত্রীশিক্ষা ও নারী প্রগতি আন্দোলন যাঁহাদের জীবনের ব্রত। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুসারে ইঁহারা নিজ শিক্ষার গুণে ভোট দিবার অধিকার পাইলেন না!

এই গুরুতর বিষয়ে কিন্তু বাংলার মেয়েরা উদাসীন থাকেন নাই। সভাসমিতির মধ্য দিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করা হইয়াছে। এমন কি কয়েকটী বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান নারী প্রতিষ্ঠান মিলিয়া বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পর্য্যন্ত দরবার করিয়াছেন। ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর দ্বিতীয় ইলেক্সন হইতে বাংলার মেয়েদেরও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যোগ্যতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নতর করা হইবে—তাঁরাও শুধু লিখিতে এবং পড়িতে জানিলেই ভোটাধিকার পাইবেন।

কিন্তু ইহা ছাড়াও বাংলার নারী সমাজের আরও অভিযোগ আছে যাহা ইহার চেয়েও বেশী গুরুতর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন থাকিল মোটে পাঁচটী—একটী য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দু'টী মুসলমান ও দু'টী হিন্দু। বাংলা কাউন্সিলের মোটমাট সংখ্যা আড়াই শত। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজের মোটমাট সংখ্যা বাংলার চেয়ে অনেক কম হইলেও সেখানকার মহিলা সিটের সংখ্যা যথাক্রমে আটটি ও ছয়টি। নূতন শাসনতন্ত্রে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু, মহিলা সিটের সংখ্যা নির্দ্ধারণের বেলায় বাংলাদেশের প্রতি যে অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

অবিচার ষোলকলায় পূর্ণ হইল সিট বিভাগের ব্যাপারে। বাংলা কাউন্সিলের মোট চারিটি হিন্দু ও মুসলমান সিটের জন্য দু'টী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইবে স্থির হইয়াছে—একটী কলিকাতা সহর, অপরটী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহর। ফল দাঁড়াইল এই যে—আগামী শাসন সংস্কার নারীকে যে অধিকার দিতেছে, কলিকাতা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ছাড়া এক কথায় সমস্ত বাংলা দেশই তাহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিলো।

এই অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, মহিলা নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে কলিকাতা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বাহিরে বিস্তৃত করিতে গেলে নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে এবং নির্ব্বাচনের কার্য্য পরিচালনা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু কেবল মাত্র এই অজুহাতে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশের মহিলা ভোটারদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন অর্থই হয় না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'একটী মজার গল্প। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন একদা এক বন্ধুর নিকট হইতে একটী ছোট খরগোস উপহার পাইয়াছিলেন। তিনি আগে হইতেই খরগোস পুষিতেন। তবে সেগুলি নূতনটীর চেয়ে বড়। নূতন খরগোসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া নিউটন ভাবিতে লাগিলেন—বড় খরগোসগুলি যে খাঁচাতে থাকে তাহার প্রবেশ পথও বড়, আর নূতন খরগোসটী ছোট সুতরাং তাহার প্রবেশ পথও ছোট হওয়া চাই। কাজেই আগেকার খাঁচায় তাহার চলিবে না। যে দ্বার পথে বড়রা ঢোকে সে পথ দিয়া ছোটটী ঢুকিবে কি করিয়া! যে মস্তিষ্ক অবলীলাক্রমে পৃথিবীর নানা জটিল বৈজ্ঞানিক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে সে মস্তিষ্ক এই সমস্যার সমাধান কিছুতেই খুঁজিয়া পাইল না!

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে কৌতুকপ্রদ বিষয়ের অভাব নাই। বঙ্গনারীর ভোটাধিকারের বেলায়ও ব্যাপার দাঁড়াইল ঠিক একইরূপ। ভারতীয় শাসন সংস্কার উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বড় বড় মস্তিষ্কগুলি তোলপাড় হইল, অথচ বাংলাদেশের হতভাগ্য মেয়েরা সকলে সমানভাবে কি করিয়া ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারেন—সেই পরামর্শ কোথাও পাওয়া গেল না। দেশের শাসনযন্ত্র আগাগোড়া সমস্তই ওলট পালট হইয়া গেল—কত কত জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হইল; অথচ অত বড় বড় মস্তিষ্ক বর্ত্তমান থাকিতে এবং কত শত প্রকার নির্ব্বাচন-পদ্ধতি তাঁহাদের জানা থাকিতে বঙ্গ নারীর জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই হইয়া দাঁড়াইল অসম্ভব!

বাংলার মেয়েদের একমাত্র ভরসাস্থল এখন হামণ্ড কমিটি। তাঁহারা যথোচিত সুবিচার করিয়া এদেশের স্ত্রীশিক্ষা ও নারী প্রগতির সহায়তা করিবেন এ আশা করা অন্যায় নয়। নতুবা বাংলা দেশে নারীর ভোটাধিকার একেবারে অর্থশূন্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রত্যেকটী নারী যেদিন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইবেন সেদিন এদেশের ইতিহাসে বাস্তবিকই এক নূতন যুগের সূচনা হইবে।

জীবন-সায়াহ্নে কবি স্বর্ণ কুমারী গাহিয়াছেন—

শীতল শান্ত বেলা
শাল শ্যামল নদী সৈকত অম্বর মেঘমালা
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা!
বাতাস গাহিছে মর্ম্ম কাহিনী,
পাতায় পাতায় হৃদয় দাহিনী
করুণ হতাশ দোলা!
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা।

'ফায়া'র দেশ

শান্তি দেবী

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে ব্রহ্মদেশটী যেন প্রকৃতির রমা লীলা-নিকেতন। বিশাল হিমালয় থেকে কতকগুলি ডানপালা বের হয়ে এসে এর উত্তর ভাগটীকে পর্ব্বত-সঙ্কুল করেছে। আর জন্ম দিয়েছে তিনটি নদীকে—"ইরাবতী", "সালউইন্" ও "সিটাং"।

পাড়াগাঁয়ের অবিবাহিতা বর্ম্মী বালিকা

নদী তিনটি বর্ম্মার দক্ষিণভাগটীকে উর্ব্বর ও শ্যামল করে মনুষ্যের নিকট লোভনীয় করে তুলেছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষই আরামপ্রিয়, বিশেষ করে দক্ষিণ বর্ম্মায়; কারণ এখানে দৈনিক আহার জোটাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না, অন্ততঃ কিছুদিন আগে হতনা, সেজন্য এখানেই লোকের ভিড় বেশী। এখানে নানা জা'তের নানা ধর্ম্মের, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির লোকের সমাবেশ।

বর্ম্মী, আরাকানী, টালাইং—এরাই হল বর্ম্মার প্রধান অধিবাসী। শেষোক্ত দুই জাতির অনেকে এখন বর্ম্মীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রায় বর্ম্মীই দাঁড়িয়ে গেছে; তবে ওদের আলাদা অস্তিত্ব যে একেবারে বিরল তা' নয়। পুরাকালে মধ্যবর্ম্মার অধিবাসী "ফিউ" নামে এক জাত ছিল; এখন আমরা যাদের খাঁটি বর্ম্মী বলি এরা হল সেই ফিউদের বংশধর। এখন অধিকাংশ বর্ম্মীই আরাকানী, টালাইং, বর্ম্মী —এই তিন জাতির মিশ্রন। "ছিন", "কেরেন", "কাছিন্", "সান্", "পাহাঙ"—এরা হল বর্ম্মার পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী; এদেরও অনেকে দক্ষিণ অঞ্চলে এসে বর্ম্মী হয়ে গেছে। তার পরে এল বিদেশীরা। বিদেশীদের মধ্যে চীনারাই সংখ্যায় অধিক। কবে কোন যুগে ওদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ ব্যবসা উপলক্ষে এদেশে এসেছিল, সেই থেকে এরা এখানেই থেকে গেছে ও বর্ম্মীদের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। চীনাদের ধর্ম্ম, বর্ণ, আকৃতি, আচার, ব্যবহার প্রায় বর্ম্মীদের মতো, সেইজন্য এই দুই জাতির মিলন হ'তে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বও হয়নি। ভারতবাসীরাও, বিশেষতঃ, তামিল ও তেলেগুরা এখানে সংখ্যায় অনেক। এরা বেশীর ভাগ কুলীর কাজ করে। আর একটী ভারতীয় সম্প্রদায়ও এখানে আছে। তাদের বলা হয় "চেটি"; চেট্টিরা বর্ম্মায় মহাজনের করে। কিছুদিন থেকে বর্ম্মায় ভদ্র ভারতীয়েরা আসতে আরম্ভ করেছেন,—এঁরা অনেকেই বড় বড় কাজ করেন।

বর্ম্মীর যে কোনও বড় শহরে দেখা যাবে নানা রংয়ের উজ্জ্বল, চোখ ঝলসান রেশমী লুঙ্গি পরে চলেছে খর্ব্বাকৃতি পীতবর্ণ বর্ম্মী পুরুষ ও নারী। এদের জামা, যাকে এরা এঙ্গি বলে, তা' সকলেরই প্রায় এক ধরণের।

রেঙ্গুনের প্যাগোডার সম্মুখ-ভাগ

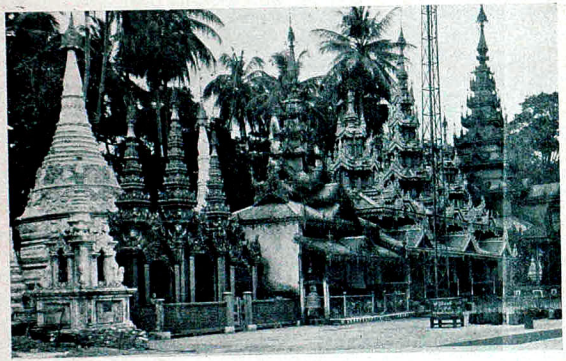

তবে মেয়েদের জামা সাদা রংয়ের, আর খুব পাতলা; কিন্তু পুরুষদের জামা রঙ্গীন ও মোটা। আজকাল বিদেশীদের অনুকরণে এদেশের ছেলেরা সর্ট ও কোট পরতে শিখছে। এদেশের পুরুষরা নানা রংয়ের ও ছিটের ছোট ছোট রেশমের টুকুরা ফেটি করে বাঁধে; আর মেয়েদের মাথায় শোভা পায় মুসলমানদের ফেজ্ টুপির মত কালো, মসৃণ, কখনও বা পুষ্প-শোভিত, কখনও বা হীরক অলঙ্কারে সজ্জিত বিরাট খোপা। মধ্যে মধ্যে কালো কিম্বা সাদা আলখাল্লা-পরা চীনাদের দেখা যায়। সান্ ও কেরেন্ মেয়ে পুরুষদের গতিবিধিও বিরল নয়: এই দুই জাতের মেয়ে-পুরুষ কালো রংয়ের লাল বর্ডার দেওয়া ঢিলা পায়জামা ও এঙ্গির মত জামা পরে। মেয়েদের গলায় নানা রকম পুঁতির মালাও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ একটু ভীতু ও অল্প-শিক্ষিত। আরাকানী টালাইঁরা 'সান্' ও 'কেরেন'দের চেয়ে বেশী শিক্ষিত হলেও, এরাও শান্ত প্রকৃতির। আসল বর্ম্মীদের মত এই সমস্ত উপজাতের ভারতবাসীর প্রতি একটা দারুণ বিদ্বেষ ভাব নাই। বর্ম্মীরা দুর্দ্দান্ত জাতি। পাহাড়ী জাতগুলো "নাট্" অর্থাৎ ভূত পূজা করে। তবে মিশনারিরা এসে এদের অনেককে খৃষ্টান করেছে ও করছে।

বর্ম্মীরা আনন্দ-প্রবণ জাত। হাসিখুশী, আমোদ আনন্দ, এই করেই এরা জীবন কাটাতে ভালবাসে। ভবিষ্যতের ভাবনা এরা ভাবেনা। সকলেরই শরীর

সুস্থ, সবল এবং দৃঢ়। এরা জ্যোৎস্না রাতে দল বেঁধে বেহালা, ব্যাঞ্জো, হাতে করে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়। উৎসব এদের লেগেই আছে। উৎসবের সময় এদের "পোয়ে" হয়। পোয়ে আমাদের দেশের যাত্রার মত। তার উপর বায়স্কোপ ত আছেই। এদের মেয়েদেরও স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণ; তবে ছেলেদের তুলনায় এরা পরিশ্রমী, কাজও করে অনেক। এদেশে অবরোধ-প্রথা নেই সেইজন্য বাজার হাটও মেয়েরাই করে। রান্না এদের খুব অল্প করতে হয় এবং আমাদের তুলনায় এদের খাওয়া অনেক সরল। বেশীর ভাগ খাদ্যই এরা কিনে খায়। এরা ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে, সুন্দর সুরুচি-সঙ্গত ভাবে সাজায়। বর্ম্মীদের রুচিও প্রশংসনীয়; একটি সামান্য কুটিরের সামনেও একটি ছোট ফুলের বাগান থাকবে। এরা বাইরে যাবার সময় পরিষ্কার ও সুন্দর পোষাক পরে, সাজসজ্জাও কম করে না—তবে একটু বিশেষত্ব আছে। মেয়েরা গহনা বেশী পরে না,—কিন্তু যে কয়খানি পরে সেগুলি খুব মূল্যবান। মাথার পরে হীরার ফুল, হাতে হীরার চুড়ী, হীরার আংটি ও গলায় সোণার একগাছি সরু হার। কখন কখন গলায় চিকের মত ও পায়ে সোণার মলের মত একরকম গহনা পরে। যাদের আর্থিক অবস্থা মূল্যবান গহনা পরার অনুকূল নয় তারা বিনা অলঙ্কারেই থাকে। কিন্তু অলঙ্কারের নামে কতকগুলি আবর্জ্জনা ব্যবহার করে না। এমনিই তাদের বেশ সুন্দর দেখায়। এরা সর্ব্বাঙ্গে একরকম চন্দনের মত মেখে থাকে—তার নাম 'তানাখা'। এতে নাকি চামড়া ভাল থাকে। অনেকেই সূচিকার্য্যে পারদর্শী। গরীব গৃহস্থের মেয়েরা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য "সেল্লেই" তৈয়ারী করে। 'সেল্লেই' বলে এদেশের চুরুটকে। বর্ম্মী মেয়ে পুরুষ সকলেই "সেল্লেই" খায়। এদেশের মেয়েরা বেশ উদ্যমশীল ও কর্ম্মক্ষম সেইজন্য মেয়েদেরই এখানে প্রাধান্য। সকল রকম সভা-সমিতিতে এরা যোগ দেয় নানা প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলে। এরা স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী নয়। আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা, মেয়েরা স্বাধীন হলেই স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে যাবে; এ ধারণা, যে কতখানি ভ্রান্ত তা' বুঝা যায় এই বর্ম্মী মেয়েদের দেখে। কি সুন্দর, নম্র ও শান্ত এরা অথচ প্রয়োজনকালে উপযুক্ত সাহস দেখাতেও কুণ্ঠিত নয়। বর্ম্মায় মেয়ে-পুরুষ সকলেই খানিকটা শিক্ষা পায়। এ ব্যবস্থা করেছে এদের "ফুঙ্গি চাঁও"। সহৃদয় ধনী ভদ্রলোকেরা কখন কখন ফুঙ্গিদের জন্য মঠ করে দেন। এখানে ফুঙ্গিরা বাস করেন ও পূজা-আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে বিনা বেতনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করেন। বর্ম্মীদের সামাজিক নিয়মানুসারে প্রায় দশ বার বৎসরের ছেলেদের পৈতা দেওয়ার মত অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে তাদের কিছুদিন এই রকম কোন একটা "ফুঙ্গি-চাঁও"য়ে থাকতে হয়।

বর্ম্মীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এরা ধর্ম্মপ্রাণ। শহরে শহরে, পল্লীতে, পর্ব্বতে, এদের মন্দির দেখা যায়। এরা গর্ব্ব করে বলে—আমাদের দেশ সুন্দর "ফায়ার" দেশ। এদের এ গর্ব্ব সত্য বলে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। পুরাকালের বর্ম্মী রাজারা আর যাই করুন বা না করুন তাঁরা অনেক ফায়া অর্থৎ মন্দির নির্ম্মাণ করে গেছেন। তাঁদের ঐ এক বিরাট কীর্ত্তি। 'আনরাঠা', 'চানসিত্তা', 'নারাথু', 'নারাতেঁইখা', ইত্যাদি যতগুলি রাজার নাম আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে কেহ বা চব্বিশ-পচিশটা কেহ বা একটা-দুটা, কেহ বা অন্ততঃ পক্ষে আধখানা ফায়াও নির্ম্মাণ করেছেন। প্রায় সবগুলিই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের আলোয় বর্ম্মী মন্দিরের উঁচু সোণার চূড়ার ঝিকিমিকি, বাস্তবিকই মনোহর।

কথিত আছে, এই সমস্ত ফায়ার মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে সুন্দর ও বড় সেগুলি নাকি প্রায়ই ভারতীয় শিল্পীদের নির্ম্মিত; যেমন পাগানের 'আনন্দ' নামে মন্দিরটি। মহারাজা 'চান্‌সিত্তা' এটি নির্ম্মাণ করান ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে। কিন্তু তারপর শুনা যায় একটি অতি নিচুর কাজ করা হয়েছিল। অন্য কোন রাজা সেই শিল্পীকে দিয়ে অনুরূপ কোন মন্দির নির্ম্মাণ করে পাছে তার কীর্ত্তি ম্লান করে দেন, এই ভয়ে বোধহয় সেই শিল্পীকে সেই মন্দিরেই হত্যা করা হয়।

পেগু একসময় বর্ম্মী রাজাদের রাজধানী ছিল।

মান্দালয় শহরের একটী সুপ্রসিদ্ধ "ফায়া" বা বৌদ্ধ-মন্দির।

সেইজন্য সেখানেও কতকগুলি বিখ্যাত মন্দির দেখা যায়। এর মধ্যে একটীর নাম "সোয়ে-তা লিংং"। এই মন্দিরে একটি শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির উচ্চতা প্রায় ষাট ফিট। দৈর্ঘ্য সেই অনুপাতে। এটি নাকি এখনও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্ত্তি। তবে শুনা যায় জাপানীরা নাকি এর চেয়েও বড় একটি বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করছে। পেগুর আর একটি মন্দির সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প আছে। এই মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর স্থাপিত। বর্ম্মীরা বলে, বর্ম্মা প্রথম জলমগ্ন ছিল, দেশ যখন জল থেকে উঠতে আরম্ভ করল, তখন এই জায়গাটি সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। তখন দুটি পাখী—একটি স্ত্রী একটি পুরুষ সেইখানে বসবার জন্য উড়ে আসে। দুজন বসবার মত জায়গা ছিল না; তখন স্ত্রী পাখীটি পুরুষ পাখীকে হারিয়ে দিয়ে সেইখানে বসে। বর্ম্মীরা বলে সেইজন্য এদেশে মেয়েদের প্রাধান্য।

সেকালের বর্ম্মী রাজারা আশনাদের মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করবার জন্য প্রায় অন্য দেশ আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ জয় করে সে দেশের মন্দিরের নানা রকম মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার, মুকুট ইত্যাদি নিয়ে আসতেন, আর নিয়ে আসতেন সে দেশের অধিবাসীদের বন্দী করে। তাদের এনে আপনাদের মন্দিরের দাস দাসী করে রাখতেন। আর সেই সব অলঙ্কার, মুকুট মন্দিরে স্থাপন করতেন। বর্ম্মীরা এখনও সেই সব মন্দিরে গিয়ে তাদের ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এদেশে আরম্ভ হলেও, এরা এদের ধর্ম্ম-প্রাণতা, জাতীয়তা সমস্তই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বড় বড় বর্ম্মী রাজকর্ম্মচারী জাতীয় পোষাক পরে রাজকর্ম্ম পরিচালন করেন। বিলাত-প্রত্যাগতরা নিজেদের জাতীয়তা হারায় না। লাটের দরবারেও এরা জাতীয় পোষাক পরে যেতে কুণ্ঠিত হয় না।

বর্ম্মীদের ধর্ম্ম-প্রাণতার মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই। এদের ধর্ম্ম মন্দিরে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রবেশাধিকার পায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানেও সকলে যোগ দিতে পারে। একই পরিবারের মধ্যে কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা খৃষ্টান—এ রকম অনেক দেখা যায়; কিন্তু তাতে কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

মাতৃভূমির আশা ও ভরসা

বেগম মুওয়াযীদজাদা সকিনা ফারুক সুলতান চৌধুরী, এম-এ; বি-এল;

ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম মুসলিম মহিলা এডভোকেট হইলেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনা করিতেছেন এবং নারী-সমাজের উন্নতিজনক নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ইঁহারা তিন ভগ্নী সকলে গ্র্যাজুয়েট।

ডাক্তার মিসেস কে, কে, মজুমদার এম, ডি।

বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি ডিগ্রি ও ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় "Golden Key" উপাধি লাভ করিয়া অল্পদিন হইল দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কুমারী রজনীপ্রভা দাশ এম-বি

আসামের নারী-সমাজের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কৃতিত্বের সহিত উচ্চ ডাক্তারী পরীক্ষা এম-বি পাশ করিয়াছেন। আসাম গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ ইঁহার প্রতিভার যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

মোমতাজ জাহান শাহ্ নওয়াজ

(বেগম শাহ্ নওয়াজের কন্যা)

ইনি স্বভাবদত্ত কাব্য-প্রতিভার অধিকারিণী। অল্প বয়সেই কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বেগম শাহ্‌জাদী বতুল বি-এ

মাননীয় আগা খাঁ পরিবারে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বি-এ পাশ করিলেন। বর্ত্তমানে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

কুমারী বিমলা রতন

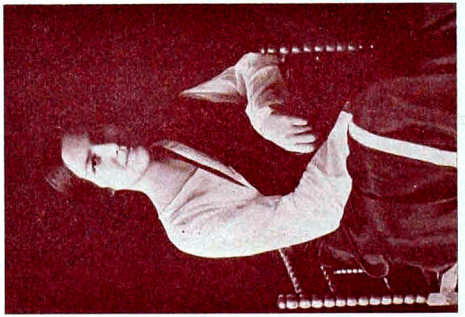

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অদ্ভুত মেধাশক্তিসম্পন্না ছাত্রী। কয়েকটী পরীক্ষায় ইনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়াছেন। ইঁহার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার একত্র সমাবেশ দেখা যায়।

বেগম এম, এ, ফারুকী বার-এট-ল
(প্রথম মুস্‌লিম মহিলা ব্যারিষ্টার)

১৯৩০ সালে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন মহিলা উক্ত কার্য্য করেন নাই। ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান সালে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন। ভারতের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোন মহিলা এই পদে মনোনীত হন নাই।

ফজিলতুন্নেছা ছোহা এম-এ

বাঙ্গালী মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এম-এ পাশ করিয়া শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন।

কুমারী করুণাকণা গুপ্তা এম-এ

এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশের আর কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বরিত হন নাই।

মিস প্যাটেল, এম-বি, বি-এস্
বোম্বাইয়ের মুস্‌লিম মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই উচ্চ ডাক্তারী উপাধি লাভ করিলেন।

মিস লীলা রাও

ভারতের শ্রেষ্ঠ নারী টেনিস খেলোয়াড় ; অল্প বয়সেই ইনি স্বদেশ ও বিদেশের বহু টেনিস খেলার প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হইয়া পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমেনা খাতুন

যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম মহিলা কমিশনার।

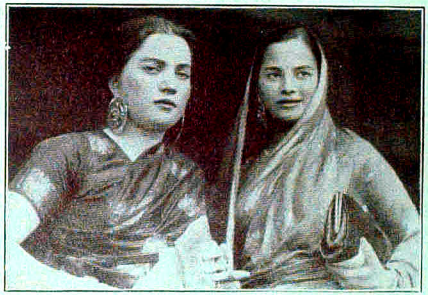

নিজাম রাজ্যের কুমারী লীলা রেড্ডী (বামে) ও কুমারী মোহিনী রেড্ডী। কুমারী লীলা চিকিৎসা-বিদ্যা এবং কুমারী মোহিনী আইন-শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

মিস ইউসুফ খাঁ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া এই মুসলিম মহিলা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপ গমন করিয়া তাহার স্বদেশের কঠিন অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিয়াছিলেন।

মিস লতিফী

লাহোরের কমিশনার মিঃ এ, লতিফী এম-এ, এল্-এল্-ডি, আই-সি-এস সাহেবের কন্যা। ইনি লাহোরের একজন বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী।

কমরুন্নেসা বেগম
ভূপালের "উম্মৎ" নামক পত্রিকার
সম্পাদিকা।

মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম-এ
বাঙলার বিখ্যাত মহিলা-কর্ম্মী,
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর,
আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর
ডিরেক্টর। ইতিপূর্ব্বে আর কোন
বাঙ্গালী মহিলা ইন্সিওরেন্স বিভাগে
এত উন্নত পদ লাভ করেন নাই।

কুমারী বীণা আড্ডী
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া
বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।
সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় ইঁহার
কৃতিত্ব অসাধারণ।

মিসেস উম্মিলা প্যারেখ
বিমান পোত চালনায় "এ" ক্লাস
লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঝড়ের দেবতা

—সলিলা ভট্টাচার্য্য

মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্তঃপ্রবাহ-স্রোতের ধারা কূল থেকে তাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই সে অন্যান্য সন্তরণকারীদের চাইতে কিছুটা দূরে এসে পড়েছে। কিন্তু, তাতে ভয়ের কিছুই নেই কেননা, হুলিয়া যুবকটি তার অতি নিকটেই সাঁতরাচ্ছিল—এত নিকটে যে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসটি পর্য্যন্ত সে অনুভব করছিল। যদি সমুদ্র তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাইরের দিকেই টেনে নেয় এবং নিজের শক্তি যদি তাকে ফেরাতে না-ই পারে তা হলে হুলিয়া যুবকটি তাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করবে। এই জেলের জাতটা হচ্ছে অতল সমুদ্রের জীব—এদের অসাধ্য কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ পর ঢেউটি কূলে ফিরে এসে হুলিয়া যুবকটিকে বল্‌লে—"কাল সকালে আমাদের হোটেলে একবার এস। তোমার ছবি তুল্‌বো। বুঝলে?"

যুবকটি মাথা নাড়লে। কিন্তু, কিছু বল্‌বার আগেই যেন কেমন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। "দেখতে পাচ্ছ ওখানে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে? আমার স্ত্রী।" অদূরে দণ্ডায়মান একটি মেয়েকে ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে।

কলিকাতা থেকে আগত মেয়েটি অদূরে দণ্ডায়মান হুলিয়া-রমণীর পানে চেয়ে একটু হাসলে। তারপর সে ধীরে ধীরে সে স্থান হতে চলে গেল।

অদূরে তার ছোট ভাইটি আপন মনে সমুদ্র-তীরে খেলা করছিল। বালি দিয়া তৈরী করেছিল সে একটা দুর্গ। তার সব চাইতে উচ্চতম চূড়ায় সে স্থাপন করেছিল তার বোনের কাণের দুল। বোনকে কাছে আসতে দেখে আনন্দে হেসে সে বল্‌লে, "দিদি, তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি। এই যে দুর্গটা দেখছো, আমি হচ্ছি গিয়ে এর প্রধান সেনাপতি। আর এর পশ্চিম-দ্বারে যে সব সৈন্যরা আছে তাদের উপর তোমাকে ক্যাপ্‌টেনের কাজ দিলুম। এবার লক্ষ্মীটি দয়া করে তোমার ক্যাপ্‌টেনের পোষাকটি পর।"

হুলিয়া যুবক তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যেতেই সে বল্‌লে, "ওর শরীরটা বুঝি খুব কোমল লাগলো না?" তার কথায় একটা আহত কঠোরতা ফুটে উঠ্‌লো।

যুবক ওর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে "না না তুমি বুঝতে পারছো না। আমি তো ওকে মোটেই ছুঁইনি। সে নিজেই বেশ সাঁতার কেটে যাচ্ছিলো।" তারপর একটু থেমে সে বল্‌লে, "শুন, পালামা। এই নিয়ে আর তামাসা করোনা। জানো তো ও একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে!"

—"তাহলে আবার কাণও তুমি ওকে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে নিয়ে যাচ্ছ?"

—"কাল সকালে আমি তার সাথে হোটেলে দেখা করতে যাব। সে আমার ছবি তুল্‌বে বলেছে।"

—"বটে!" কথাটি সে এমন করে উচ্চারণ করলে যেন সমস্তই সে বুঝতে পেরেছে। "সে তোমার ছবি তুল্‌বে, কেমন? সে তোমাকে ভালোবাসে, কেমন?"

যুবকটি অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লে,—"তুমি বুঝতে পারছনা, এটা হচ্ছে ওদের একটা বড় মানুষী

খেয়াল। ওরা সব কিছুরই ছবি তুলতে ভালোবাসে। সমুদ্রের ঢেউ, আকাশের মেঘ, মাটির ঘর, পাথরের মন্দির—এমন কি বাঁদর পর্য্যন্ত। তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে বাঁদরকেও তারা ভালোবাসে?"

মেয়েটি আর কোন কথা বল্লে না। কেবল নীরবে একবার গভীর দৃষ্টিতে তার ব্যথিত উদার দুই চোখে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইলে। কিছুক্ষণ পর সে বল্লে, "মঙলু, তুমি কিছু জাননা। তুমি একটা বোকা গাধা।"

সমুদ্রের ধার দিয়া তারা পাশাপাশি চলছিল। চলতে চলতে পালামা আপন মনে বলতে লাগলে, "পরিষ্কার চামড়ার প্রতি মানুষের এত মোহ কেন? ও আর এমন কি ভালো? কালো রঙ কত সুন্দর। দেখলে দুই চোখ জুড়ায়ে যায়। কালো পাথর দিয়ে ভগবানের মন্দির তৈরী হয়। আর সেই মন্দির তৈরী করে যে দেবতা ব্রাহ্মণেরা তারাও আমাদেরই ন্যায় কালো।" সে একবার মঙলুর মুখের পানে চেয়ে নিয়ে আবার আপন মনে বলতে লাগলে, "ওদের দেহই বা এমন কি সুন্দর। সেই হাড়গিলা-ডিড়হিড়ে হাড় আর চামড়ায় লাগানো দেহ। তার উপর যত সব গিল্টি-করা রঙ। আর আমরা হুলিয়া মেয়েরা! কেমন সুন্দর স্বাস্থ্যবতী! কিন্তু, পুরুষগুলি এমনি বোকা যে তাদের কোন রুচি-জ্ঞানই নেই।"

মঙলু এবার ধমক দিয়ে বল্লে, "থাম. যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।" বলে তীব্র দৃষ্টিতে পালামার মুখের পানে চাইলে।

পালামাও তার পানে কঠিন দৃষ্টি হেনে বল্লে, "ইচ্ছা হয় আমাকে মার। আমার জীব টেনে বের করে ফেল। কিন্তু, আমি থামবোনা। আমি জানি নিজের দোষ স্বীকার করবার মত সাহস তোমার নেই। তুমি কাপুরুষ!"

মঙলু কিছুটা আবেগের সাথে বল্লে, "পালামা তুমি ভুল করছ। কোন হুলিয়া যুবকই ভদ্রঘরের মেয়েদের ভালোবাসতে পারে না। আমরা হুলিয়ারা হচ্ছি কিছুটা ঝড়ের মত, সমুদ্রের মত উদ্দাম, উদাত্ত! মোমের পুতুল আমরা নই। তাছাড়া এও কি সম্ভব যে ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রতি আমরা নজর দিতে পারি! আমরা তো জানি যে তারা আমাদের ছোটলোক জেলে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। আমরা তো জানি তাদের চোখে আমরা মানুষ নই। তুমি নেহাতই সরল, তাই বুঝতে পারছ না পালামা। তা কেমন করেই বা বুঝবে! জীবনের ব্যাপারে তোমার তো আর তেমন অভিজ্ঞতা নেই! শহর থেকে পূরা তিন দিনের পথ দূরে থাকতে হয়েছে তোমাকে সারা জীবন। সুতরাং কিছু তো আর দেখনি! বুঝবে কি আর ছাই। এর আগে কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে দেখনি বুঝি, কেমন?"

—"আমি দেখতেও চাইনি কোনদিন।" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বল্লে। কি একটা অদ্ভুত ব্যথার জ্বালা যেন সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল।

আবার তারা চুপচাপ পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা অতীত দিনের কথাগুলি ভাবতে লাগল। সে বেশী দিন নয়। মাত্র দু'বছর আগে তাদের ছোট্ট হুলিয়া উপনিবেশে মঙলু প্রথম এসেছিল। সেখানে সে এসেছিল তার বৃদ্ধা মাসীর বাড়ীতে বেড়াতে। কিন্তু হঠাৎ একটা পর্ব্ব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যের মজলীসে দেখা হয়ে গেল পালামার সাথে। তারপর দুইজনে আবদ্ধ হল নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে। মঙলু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পালামার বাপের কাছে গিয়া একদিন হাজির হলো। পালামার বৃদ্ধ বাপ তাতে সম্মতি প্রদান তো করলেই না বরঞ্চ তারও উপরে মঙলুকে গাল দিয়া সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। পালামার বাপের ইচ্ছা ছিল

মেয়েকে সে বিয়ে দিবে তাদেরই স্থানীয় মোড়লের ছেলের সাথে। এবং কাজের বেলাও সে তাই করলে। পালামার কোন আপত্তি, কোন দোহাই-ই খাটলো না। মোড়লের ছেলের সাথেই তার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু পালামা কিছুতেই ভুলতে পারলে না মঙলুর কথা। তার সমস্ত ক্রোধ পড়লো গিয়া তার স্বামীর উপরে। সে প্রতিজ্ঞা করলে যে কিছুতেই সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করবে না। তারপর স্বামী যেদিন তাদের বাড়ীতে এলো সে তখন তার সাথে এমনি কঠিনভাবে ব্যবহার করলো যে তার ফলে সেই লোকটি তাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে বাধ্য হলো।

তারপর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পালামার পিতা মঙলুর সাথে তার বিয়ে দিতে সম্মত হলো। তার বিশ্বাস ছিল যে এই শহর থেকে ফেরা ছেলেগুলি সাধারণতঃই বড় ধূর্ত্ত হয়ে থাকে। সে-সব সত্ত্বেও বিয়ে তাদের হয়ে গেল। জাতির পুরাতন প্রথা অনুযায়ী ঘোড়ার পিঠে, সামনে বর ও তার পিছে কনেকে বসিয়ে দিয়ে সমস্ত উপনিবেশটা ঘুরিয়ে আনা হলো। এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে পালামার মনে হলো যেন সে সেই অতীতের ঘটনা-স্থলেই বুঝি বিচরণ করছে। হঠাৎ তার সেই ধ্যান ভাঙলো মঙলুর কথায়। মঙলু বল্লে, "পালামা, তুমি ওই ভদ্রমেয়েদের মত সিঁথি কাট না কেন? আর অমনি করে বেণী। ও আমার কিন্তু বেশ লাগে।"

সহসা বেত্রাহতের ন্যায় পালামার অন্তরটা মোচড় দিয়া উঠলো। তার ওষ্ঠ দু'টি কাঁপতে লাগলো। সে বল্লে "বোকা! আঃ বাস্তবিকই তুমি একটা বোকা গাধা।"

রাত্রিদিন কেবল একটি কথাই পালামার মনে জাগতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো যেন সেই ফ্যাকাশে হাংলা মেয়েটি তার স্বামীকে ঘিরে একটা কঠিন মায়াজাল বিস্তার করে চলেছে। মঙলু প্রায়ই তার কথা নিয়ে আলাপ করে। সে যখন তার কথা বলে তখন তার চোখ দুটি যেন কি এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে সেই মেয়েটিকে নিয়ে মঙলু সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যায়। পালামা কূলে দাঁড়িয়ে তাদের পানে চেয়ে থাকে। একদিন সে দেখতে পেলে যে বৃহৎ একটা ঢেউ গর্জ্জন করে আসছে দেখতে পেয়ে সেই মেয়েটি মঙলুর বলিষ্ঠ বাহুখান চেপে ধরে ঢেউয়ের সাথে দুলতে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে পালামার মনে হলো যেন তার হৃদয় ফেটে এখনি একটা ভীষণ চীৎকার বার হয়ে পড়বে। সেই মেয়েটির প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণায় তার সমস্ত দেহ-মন ভরে উঠলো।

সেই মেয়েটির ছোট ভাইয়ের প্রতিও তার ক্রোধ হলো—দারুণ একটা ঘৃণা জন্মালো। কেননা সে মঙলুর কাছে শুনেছিল যে সেই ছোট ভাইটিকে নাকি সে খুব ভালোবাসে। তার মা মরে যাওয়ার পর থেকে সে-ই নাকি তাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে

একদিন মঙলু একখানা ছবি দেখিয়ে তাকে বল্লে, "এটা আমার ছবি। সেই ভদ্রমহিলাটি এটা আমার জন্য তুলেছেন।'

সে কিছুক্ষণ ধরে ছবিটা দেখলে। তারপর বল্লে, "সেই মেয়েটি তাহলে তোমার ন্যায় একটা লোকও তৈরী করেছে! আমি জানি তার যাদু-বিস্তার জন্য এটা দরকার হবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখন থেকে পালামার সবকিছু শেষ হয়ে গেল।"

মঙলু কিছুটা ক্রোধের সাথে বল্লে, "কি? সে আমাকে যাদু করবে? তুমি এ-সব কি বলছো পালামা! বাস্তবিকই তোমার মন এত বিশ্রী!"

পালামা কিছু বল্‌লে না। দুই ঠোঁটে তার ফুটে উঠ্‌লো একটা ফাঁকা হাসির রেখা। বুকের উপর দুই হাত বেঁধে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে।

তারপর এলো পবন-দেবতার পূজার দিন। হুলিয়াদের সবাজে এই পূজার ব্যাপারটা ছিল একটা বিশেষ পবিত্র জিনিষ। মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দে রাত্রির অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌লো। দেবতার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা ঘিরিয়া হুলিয়া যুবক-যুবতীগণ তালে তালে নৃত্য করতে লাগলো। মাটির ভাঁড়ে করিয়া দেশী মদ পান করতে লাগলে—তার সঙ্গে চলতে লাগলো গান।

তারপর রাত্রি ভোর হতে না হতেই নানা রঙে রঞ্জিত সমুদ্রগামী ডিঙিগুলি নিয়ে পুরুষেরা মাছ ধরতে বা'র হয়ে পড়্‌লো। মেয়েদের হাতে ভার রইলো দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মুরগীগুলির গলা চেপে মেরে তাদের সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেবার কাজ।

কলকাতার সেই মেয়েটি যখন তার ছোট ভাইকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলো পূর্ব্ব গগনে তখন উষার সৌন্দর্য্যে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। জেলে ডিঙ্গিগুলি তখন অনেক দূরে চলে গেছে। কূলে থেকে হুলিয়া মেয়েরা পবন-দেবতার উদ্দেশে ভাসিয়ে দিচ্ছে মুরগীর প্রাণহীন দেহগুলি। মেয়েটি সমুদ্রের পানে চেয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লে, "আঃ ঐ জেলেদের নৌকতে করে' যদি আজ সমুদ্রে যেতে পারতুম তো কি মজাটাই না হোত।"

পালামা তার কাছেই ছিল। মেয়েটির দিকে অগ্রসর হয়ে এসে সে বল্‌লে: "তুমি সমুদ্রে বেড়াতে যাবে? আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

—"ওহো...তুমি আমাকে নিয়ে যাবে!" মেয়েটি খুব আহ্লাদিত হয়ে বল্‌লে।

পালামা তার মুখের পানে চোখ না তুলেই বল্‌লে: "হাঁ আমার ছোট ডিঙিতে করে তোমাকে নিয়ে যাব—তোমার ভাইকেও সঙ্গে নেব। তার আগে একটু সবুর কর—আমি মুরগীটাকে মেরেনি'।"

মেয়েটি অধীর হয়ে বল্‌লে: "না না তুমি আগে নৌকা নিয়ে এসো। মুরগী পরে মারবে'খন।"

পালামা মুরগীটা ওর হাতে প্রদান করে চলে গেল তার ডিঙি আনবার জন্য। পালামা চলে যেতেই টুকুন তার বোনের হাতে থেকে মুরগীটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে: "না আমি এটাকে কিছুতেই মারতে দেব না।"

—"টুকুন—" বলেই তার ভগ্নী থাম্‌লে। তার চোখের সামনে হুলিয়া মেয়েরা মুরগীগুলিকে গলা টিপে মেরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিলো। তাদের মৃত্যু কাতরাণী—পাখার ঝাপটা-ঝাপটি শুনে টুকুনের বগলে চেপে-ধরা মুরগীটা ভয়ে নিষ্পন্দ মরার ন্যায় নীরব হয়ে রইলো। মেয়েটি তার সাথের ভৃত্যটিকে বল্‌লে: "তোমার ধুতির কোচায় লুকিয়ে এটাকে হোটেলে নিয়ে যাও। আমি পরে আস্‌ছি।"

কিছুক্ষণ পর পালামা ফিরে এসে বল্‌লে: "নৌকা এনেছি। এবার চল যাওয়া যাক্।" তার ঠোঁটে ফুটে উঠ্‌লো একটা রহস্যজনক হাসির রেখা।

কলকাতার মেয়েটি বল্‌লে যে তার কাছে যে মুরগীটা রাখা হয়েছিল সেটাকে সে হুলিয়াদের আচার অনুযায়ী মেরে ফেলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।

তারপর ছোট ডিঙিখানাতে করে তারা সমুদ্রে ভাস্‌লে। উত্তাল তরঙ্গ দোলায় ডিঙিখানা তাদের দুলতে লাগলো। পালামা দাঁড় টান্‌তে লাগলো। কিন্তু, দেখা গেল তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে টুকুন ও তার বোনের উপর তারপর সহসা এক সময়ে তার ঠোঁটে ফুটে উঠ্‌লো, একটা কঠিন নির্ম্মম হাসি। মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে পালামা বল্‌লে:

"শুন, তুমি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ তোমার উপর আমি প্রতিশোধ নেব। আমার হৃদয় থেকে আমার স্বামীকে তুমি যেমন করে ছিনিয়ে নিয়েছ—ঠিক তেমন করে তোমার ভাইটিকে আজ আমি ছিনিয়ে নেব। ওকে আমি হত্যা করবো... বুঝ্‌লে?"

মেয়েটি দেখ্‌লে পালামা দাঁড় ছেড়ে দিয়ে নৌকার পাটাতনের নীচে থেকে একটা ছুরি বা'র করছে। সে আবার ক্রোধভরে বল্‌লে: "ডাইনী, তুই আমার স্বামীর প্রতি লোভ করছিস্! রাক্ষুসী! তোর ভাইকে আজ টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে সমুদ্রের হাঙ্গর কুমীরকে খাওয়াব। তখন বুঝতে পারবি একজনের আদরের ধন কেড়ে নিলে কেমন লাগে।"

মেয়েটি এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলো না। হতভম্বের ন্যায় সে দাঁড়িয়ে রইলো। ছোট ভাইটি ভয়ে তার দিদিকে জড়িয়ে ধরল। পালামা তাদের পানে এক পা অগ্রসর হয়ে এলো।

মেয়েটি ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌লে: "কেন, আমরা তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি'। মঙলুর কাজের জন্য রোজই তো তাকে আমি পয়সা দি'। আমার কাছে তার একটি পয়সাও তো পাওনা নেই।"

—"পয়সা! পয়সা জাহান্নমে যাক।" বলে' পালামা ক্রোধে জলে উঠে ছুরিখানা বাগিয়ে ধরলে।

মেয়েটি কেঁদে ফেলে বল্‌লে: "কেন তুমি আমাদের সাথে এমনি কচ্ছ। তোমার মুরগীটা আমরা মারিনি' বলে? ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি রাগ করো না! আমাদের কূলে ফিরিয়ে নিয়ে চল—তোমার মুরগী আমরা ফিরিয়ে এনে দেব।"

—"কি, তুমি মুরগীটা বধ করনি!" পালামা হঠাৎ চম্‌কে বলে উঠ্‌লো।

মেয়েটি বল্‌লে: "না, সেটা আমাদের চাকরের কাছে রেখে এসেছি।"

পালামার বড় ভয় হলো। মনে হলো যেন তরঙ্গ-উদ্বেলিত বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর সে ভয়ঙ্কর পবন-দেবের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত মুরগীটা হত্যা করা হয়নি'। পালামার মনে হলো যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে' সাক্ষাৎ পবন-দেব আবির্ভূত হয়েছেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্য অন্ধকার করে ঝড় উঠেছে। পর্ব্বত প্রমান সহস্র ঢেউয়ের ফণা তুলে সমুদ্র যেন মেতে উঠেছে। মঙলুর জন্য তার বড় ভয় হলো। হয়তো সে রক্ষা পাবে না। পালামা বিনীত কণ্ঠে মেয়েটির পানে চেয়ে বল্‌লে: "তোমাদের দু'জনকে আমি কূলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মুরগীটা আমাকে ফেরত দেবে?"

"—হাঁ!" একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মেয়েটি বল্‌লে।

তারা কূলে এসে নাম্‌তেই একটি ছেলে দৌড়ে এসে বল্‌লে: "পালামা মাসী একটা লোক তোমার মুরগী চুরী করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে ধরে ফেলেছি। আর তোমার মুরগীটা মেরে পবন-দেবতাকে দিয়ে দিয়েছি।"

পালামা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে চেয়ে দেখলে সেই মেয়েটি তার ছোট ভাইয়ের হাত ধরে দ্রুতপদে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ইস্‌লামে নারীর স্থান

কুমারী রওশন আক্‌তার

আজ প্রায় তের শত বৎসর যাবৎ মুসলমান মেয়েরা তাহাদের সমাজ-জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে পুরুষের সাথে যে সম-অধিকার ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়া আসিতেছেন তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের ধর্ম্মের উদারতা। ইস্‌লাম মেয়েদের যতটা অধিকার প্রদান করিয়াছে দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম্মের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছে কি না সন্দেহ। কেননা, ইস্‌লামের ভিত্তি হইতেছে গণ-তন্ত্রের উপরে এবং তাহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের ন্যায়তঃ অধিকার রক্ষা করা।

তাই আমরা দেখিতে পাই নারী তাহার বাপ-মায়ের সম্পত্তিতে তাহার ভাইদের সাথে নিজের অংশ অনুযায়ী অধিকারিণী এবং বাপ-মায়ের প্রতি তাহার ভাইদের যতখানি অধিকার আছে তাহারও ঠিক ততখানি অধিকার। ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে বাপ-মায়ের কর্ত্তব্যও ঠিক তেমনি সমান। ছেলেকে শিক্ষিত ও মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা যেমন বাপ-মা এবং সমাজের জন্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে মেয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাদিসে জোর করিয়া বলা হইয়াছে, "প্রত্যেক মুস্‌লিম নরনারীর জন্য জ্ঞান অর্জ্জন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।"

বাপ মায়ের ঘরে নারী যে অধিকারে অধিকারিণী স্বামীর গৃহে গিয়াও তাহার সেই অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বামীর গৃহে গিয়া সে হয় ছোট্ট সংসারটীর সম্রাজ্ঞী। ঐস্‌লামিক বিধান অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয় স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তিতে তাহার একটা অংশ। ইহা ব্যতীত তাহার স্বামীর প্রতি নির্দ্ধারিত পণের টাকা ইচ্ছা মাত্র যে কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার কাছে থেকে আদায় করিয়া লইতে পারেন। এবং ইহা সত্তেও তাহার এমন অধিকার থাকে যে স্বামী যদি রোগগ্রস্ত হন কিম্বা কুৎসিৎভাবসম্পন্ন হন তবে ইচ্ছা করিলে সে তাহাকে আইনতঃ বর্জ্জন করিতে পারে। মোটের উপর তাহার স্বাধীনতার কোন ব্যতিক্রমই ইস্‌লামে পরিদৃশ্য হয় না! কি বাপ-মায়ের ঘরে, কি স্বামীর ঘরে, সবখানেই সে স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। এদিক দিয়া দেখা যায় এক মাত্র ইস্‌লামই নারীকে সর্ব্বপ্রথম অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে।

পরদা সম্বন্ধে ইস্‌লামের বিধানের মানে হইতেছে এই যে তোমরা শরীরের সেই সমস্ত স্থানগুলি মুক্ত রাখ যাহা মুক্ত রাখা প্রয়োজন। চোখ, মুখ, হাত, পা ঢাকিয়া দম বন্ধ করিয়া রাখিবার মানে পরদা নয় এবং ইহা ইস্‌লামেরও বিধান নয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় পরদার নামে ভারতবর্ষ যে মেয়েদেরকে আলো, বাতাস, জ্ঞান, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করিয়া চারখানা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা—তাহা কস্মিনকালেও ইস্‌লামের বিধান নয়। কেননা, জাতির অর্দ্ধেক জীবন যে নারী তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ ইস্‌লাম কখনও দিতে পারে না।

হজরতের সম-সাময়িক যুগ থেকে আরম্ভ করিয়া কি কর্ম্ম-জীবনে কি সামাজিক বা অর্থ-নৈতিক জীবনে, সব দিক দিয়াই মুস্‌লিম নারীগণ তাহাদের স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। ইস্‌লামের প্রথম যুগে নারী

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন আহতদের সেবার জন্য এবং পুরুষেরা যখন বাহিরে গিয়াছেন তাহারা তখন শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করিয়াছেন আপন আপন গৃহ। এমন কি পুরুষদের সহিত কঠিন নির্য্যাসিত জীবনও তাহাদের যাপন করিতে দেখা গিয়াছে। তারপর ইস্‌লামের মধ্য-যুগে নারীকে আমরা দেখিতে পাই কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষয়িত্রী, সংস্কারিকা, রাজনীতিবিদ্, তপস্বিনী ও সম্রাজ্ঞী-রূপে। সেই যুগের ফাতেমা, আয়শা, জয়নব, রাবেয়া প্রমুখ গুণবতী মহিলাদের কথা কে ভুলিতে পারে? তাহা ব্যতীত আমাদের দেশের নুরজাহান, জেব-উন্-নেসা, চাঁদবিবি ও সম্রাজ্ঞী রাজিয়া প্রমুখ বিদুষীদের প্রতিষ্ঠাই কি কম বিস্ময়ের সামগ্রী? ইস্‌লামের আদর্শ যদি পরদার অন্তরালে অবরুদ্ধ বন্দী-জীবন যাপন করাই হইতো তাহা হইলে এই সমস্ত বিস্ময়কর প্রতিভার জন্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যে কখনো সম্ভব হইতো কি?

আজ যে ইস্‌লাম বিরুদ্ধ পরদার বিধি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহার ফলে আমাদের সমাজ-জীবনের অর্দ্ধেক অঙ্গ যে নারী সে হারাইয়াছে তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তি। দেহ হইয়াছে তাহার রোগের ঘর এবং মন হইয়াছে তাহার সঙ্কীর্ণ ও পঙ্গু। সুতরাং এই ভগ্ন-স্বাস্থ্য সঙ্কীর্ণমনা নারীদের কাছে থেকে কেমন করিয়া আমরা আশা করিতে পারি সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্ম? এক সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া ইস্‌লাম মনুষ্য জাতিকে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলো ন্যায়-অন্যায়ের প্রতি একটা সত্য-দৃষ্টি এবং সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনের প্রতি নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে একটা সমান কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও সেই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালনের জন্য তাহাদের সম শক্তির অধিকার। ইস্‌লামের গৌরব-যুগে এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালনের জন্য নারী-পুরুষকে সমানভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়াই এত বড় একটা জাতি গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন,—"মেয়েদের সম্মান প্রদর্শন কর।" এবং অন্যত্র—"জননীর পায়ের নীচে স্বর্গ বিরাজমান।" নারী সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর ধারণা আর কি হইতে পারে? আজ আমরা মুস্‌লীম নারীরা যে আমাদের ন্যায়তঃ অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি সে ইস্‌লামের ত্রুটির জন্য নয়, সেই ত্রুটি হইতেছে আমাদের। কেননা, আমরা জীবনের ঔদার্য্য দিয়া জ্ঞান দিয়া বুদ্ধি দিয়া ইস্‌লামকে গ্রহণ করি নাই। আজ আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে ইস্‌লামের সেই সব বিধান মানিয়া চলা, আল্লাহতালা আমাদের জন্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ
মুকুতা মাণিক নিধি, আমারে বিওনা বিধি
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে, প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান
আমি চাই মহত্তর মহত পরাণ।"

—মানকুমারী বসু।

কুমারী আছিয়া মজিদ বি,এ,
প্রবন্ধ—"নবযুগের শিশু"
৪০৭ পৃষ্ঠা

শান্তি দেবী
প্রবন্ধ—"ফায়ার দেশ"
৪৭৩ পৃষ্ঠা

জাপানের নারী

মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাপানে নারী-সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তন যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই অভিনবনীয়। জাপানী নারীর শিক্ষা কর্ম্ম, বেশ-ভূষা, পরিচ্ছদ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন এক নূতন সমাজ-জীবন আরম্ভ হইয়াছে।

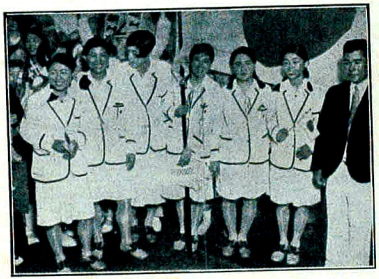

সুপ্রসিদ্ধ জাপানী নারী-খেলোয়াড় দল

জাপানের এই যুবতী খেলোয়াড় দল প্রেগ্ শহরে মহিলাদের অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছেন। বাম দিক হইতে ডানে—মিস্ এইচ, হজো, মিস্ এস, নাকানিশি, মিস, কে, হিতোমী (ক্যাপ্টেন্) মিস, এস, ওয়াতানাবী, মিস, এম, মুরাওকা এবং সি, হামাজাদী।

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রাক্কাল, ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত জাপানী নারী বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ বড় একটা রাখিত না। রাজপথে ইহারা চলিত সলজ্জ এবং সশঙ্ক দৃষ্টিতে; হাতগুলি লুক্কায়িত থাকিত লম্বা ঢিলে পোষাকের অভ্যন্তরে। লোক-সমক্ষে নারীর হাত-দু'খানি পর্য্যন্ত বাহির করা অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল। আর আজ! জাপানী নারী গাউন-পরিহিতা; গতি তাহার স্বচ্ছন্দ, দৃষ্টিতে সামান্য সঙ্কোচ বা শঙ্কার ভাবও নাই। ইহারা পুরুষের সঙ্গে অকুণ্ঠিত চিত্তে দোকানে, অফিসে, হোটেলে সর্ব্বত্রই কাজকর্ম্মে যোগদান করিতেছে। সামাজিক মেলামেশাও করিতেছে।

জাপানে নারী-প্রগতি আরম্ভ হয় ১৯০৫ সনের পর। রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর জাপান ক্রমশঃ শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। কল-কারখানায় মজুরের চাহিদা এত বাড়িয়া যায় যে, কেবল মাত্র পুরুষ শ্রমিক দ্বারা কার্য্যোদ্ধার আর সম্ভব হয়না। সুতরাং নারীকে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া দলে দলে কল-কারখানায় যোগ-দান করিতে হয়। ক্রমে মেয়েরা সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের সহকারী হইয়া উঠে। তাহারা হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সরকারী কর্ম্মচারী, অধ্যাপক, আইনব্যবসায়ী ও আদালতের বিচারক-পদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে জাপানী নারীরা আরও বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধে ব্যাপৃত শক্তিপুঞ্জের নিকট জাপান শিক্ষালাভ করে যে, সঙ্কট সময়ে নারী এবং পুরুষকে সমানে কার্য্যে

নিযুক্ত করা প্রয়োজন। নারীদিগকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাপানে মেয়েদের শিক্ষারও আমূল সংস্কার করা হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়াম ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত

স্বাস্থ্য-সপ্তাহ উদযাপনে জাপানী নারী

জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য জাপানী রমণীরা ঔষধ, রোগ ও তাহার প্রতিকার-সম্বন্ধীয় পুস্তক বিতরণ করিতেছেন।

হইয়াছে। আজ জাপানী নারী কেবলমাত্র শিক্ষিতাই নয়; তাহারা অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-সম্পদেরও অধিকারিণী।

জাপানী মেয়েদের পরিচ্ছদ এবং বেশভূষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পের সময় যে দারুণ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয় তাহাতে টোকিও এবং ইয়োকোহামা শহর ভস্মাবশেষে পরিণত হয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় দেশীয় কিমনো পোষাক লইয়া জাপানী মেয়েরা বিষম অসুবিধায় পতিত হয়। এই অপূর্ব্ব ঢিলা পরিচ্ছদের জন্য বহু নারীকে জীবন্ত দগ্ধ হইতে হয়। ভূমিকম্পের অবসানে জাপানী নারী ইউরোপীয় পোষাকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে।

জাপানী নারীর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণের এইটাই একমাত্র কারণ নয়: যে সব মেয়েরা মোটর ড্রাইভারের কাজ বা ট্রামে, বাসে, কণ্ডাক্টারের কাজ করে কিম্বা যাহারা বিমানপোত-চালক তাহাদের পক্ষে প্রাচীন কিমনো পোষাকে চলা ফেরা করা একেবারেই অসম্ভব। জাপানের ক্রম-বর্দ্ধমান নৃত্য-শিক্ষালয়গুলিও মেয়েদের বিলাতী পোষাক পরিচ্ছদের পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে। তাই বলিয়া প্রাচীন পোষাক যে একেবারে বর্জ্জন করা হইয়াছে তাহা নয়; ঘরসংসারে বিশেষতঃ বয়স্কা নারীদের এখনও, কিমনো ভক্ত দেখা যায়। তবে কর্ম্মক্ষেত্রে জাপানী মেয়েরা কদাচিৎ কিমনো পোষাক পরিধান করিয়া থাকে।

জাপানী কিমনো পোষাকের যেমন একটী নিজস্ব বিশেষত্ব আছে জাপানী মেয়েদের খোঁপা বাঁধার মধ্যেও তেমনি একটা সৌন্দর্য্যানুভূতি নিহিত আছে যাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী মেয়েরা ক্রমশঃই 'বব্' ফ্যাসানে চুল ছাঁটায়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। সুখের বিষয়, আধুনিক জাপানী তরুণীরা আবার খোঁপার পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে।

খেলা-ধূলার ব্যাপারে দেখা যায়, জাপানী-নারী আন্তর্জ্জাতিক বড় বড় ক্রীড়ায়ও যোগদান করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। মিস্ কিনু-হিতোমী নাম্নী জাপানী নারী খেলোয়াড় ১৯২৬ সালে সুইডেনের মহিলা অলিম্পিক ক্রীড়ায় জাপানের জন্য ১৫ পয়েণ্ট জয় করিয়া একটী আন্তর্জ্জাতিক মেডেল পারিতোষিক লাভ করেন। মিস্ কানো মাসাকো নামক আর একজন জাপানী তরুণী ১৯২৬ সালে আন্তর্জ্জাতিক বাস্কেট থ্রোয়িং খেলার প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সুশিক্ষিতা জাপানী মেয়ে

ভলিবল, বাস্কেট বল, টেনিস, দৌড়, ঝাঁপ, কুস্তি প্রভৃতি ক্রীড়ায় জাপানী তরুণীরা বিশেষ পারদর্শিনী।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের জাপানী মহিলা

ফুল জাপানী মেয়েদের প্রিয় সামগ্রী। মহিলাটী তাহার নিজের বাগানের ফুল গাছে জল সিঞ্চন করিতেছেন

খেলা-ধূলার মত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাপানী নারীর অনুরূপ জয়-যাত্রা আরব্ধ হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের শেষপ্রান্তে অবস্থিত, এই দ্বীপটী নারী-প্রগতিতে এশিয়ায় শীর্ষস্থানই অধিকার করিয়াছে।

কবি হিরণ রায়

—গল্প—

সতী দেবী বি-এস্-সি

হিরণের সম্যক ইতিহাসটা হয়ত তোমরা জানো না। একদিন সত্যই গান ও কবিতা লিখিয়া সে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজ কাশ্মীর ষ্টেটের দেওয়ান হিরণ্ময় রায়কে দেখিয়া তোমরা হয়তো সেই পূর্ব্বতন কবি হিরণ রায়কে ঠিক কল্পনা করিতে পারিতেছ না। এখন আর তাহার প্রতি কথায় ব্রাউনিং সেক্সপীয়রের কোটেশন্‌ও শোনা যায় না; রাবীন্দ্রিক ঢঙের সেই বাব্‌রী চুলেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া যে তাহার জীবনে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল সেই কথাটাই আজ বলিব।

হিরণ্ময় তখন "চাঁদের আলো" বলিয়া তাহাদের নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করিত। কাগজখানায় অন্যতম সম্পাদক ছিল অবনী মুখোপাধ্যায়। তাহাদের সেই কাগজখানাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ছোট খাটো একটি সাহিত্যিক দল। তাহাদের অধিকাংশই ছিল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র। বিকাল বেলা অবনীদের বাটিতে বসিত এই উদীয়মান সাহিত্যরথীদের আলাপ-আলোচনার আড্ডা। সে দিন কি একটা ব্যাপারে তাহাদের আড্ডাটা হইয়া উঠিয়াছিল বেশ একটু সরগরম। বড় "হল" ঘরটার এক পাশে হিরণ ও অবনীর মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়াছে। হিরণের বক্তব্য, "মলিনা দেবীর" পাঠানো লেখাটি আগামী সংখ্যা "চাঁদের আলোতে" ছাপাতেই হইবে। অবনীর তাতে ঘোরতর আপত্তি—"মলিনা দেবীর লেখা ছাপান যায় না কোনমতেই। ওর চেয়ে ঢের ঢের ভালো লেখা পাঠিয়েছে যতীশ রায়, পরেশ গুপ্ত। এত সব ভাল লেখা থাকতে ওরকম লেখা ছাপান চলে না।"

হিরণও নাছোড়বান্দা! সে, বলিল—"আচ্ছা আমিও সব সংশোধন ক'রে দিয়ে লেখাটা এমন দাঁড় করিয়ে দেবো যে তোমার ঐ যতীশ রায়, পরেশ গুপ্তর লেখা ও লেখার কাছে দাঁড়াতেই পারবে না"

অবনী এবারে হাসিয়া বলিলো—"এত করেই যদি ও লেখাটা ছাপাতে ইচ্ছা থাকে তা'হলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার এ কষ্ট স্বীকার করার মানে তো আমি কিছু বুঝি না।"

যথা সময় হিরণের দ্বারা সংশোধিত মলিনা দেবীর লেখা অবনীর কাছে পৌছিল। লেখাটাতে তখন এতটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, মলিনা দেবীর নামটুকু ছাড়া তা'র নিজস্ব আর কিছুই তাহাতে নাই। এরকম ব্যাপার নূতন নয়। "চাঁদের আলোর" জন্ম থেকেই হিরণের এই দুর্ব্বলতা বন্ধু মহলে বেশ একটা আমোদের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

সেবারে "চাঁদের আলো" প্রকাশিত হইবারি আগে নতুন এক বিভ্রাট ঘটিল। হিরণ একটি গান লিখিয়া আনিয়াছে ছাপাইবার জন্য। বন্ধু মহলে ও জিনিষটা সম্বন্ধে কারোরই কিছু জ্ঞান ছিল না কেবলমাত্র মনীশই যা মাঝে মাঝে এক-আধটা গানের কস্‌রৎ করে। সুতরং তাহারই উপর ভার পড়িলো গানটা একবার দেখিয়া দিবার। মনীশ রায় গানটা একবার একটু পড়িয়া হইয়া বলিলো "গান আর কবিতার মধ্যে তফাৎ কি বলতে পার হিরণ?" সঙ্গীত

অনভিজ্ঞ হিরণ আর কি বলিবে? ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একথা সেকথার পর সে বলিলো—"দেখ একখানা পত্রিকা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুল্‌তে হলে তাতে পাঁচ রকম জিনিষ থাকা দরকার। গান একটা করে প্রতিমাসেই থাকা ভাল।"

সহকারী সম্পাদকের অভিমত যে, প্রতি মাসে গান একটা করে ছাপাইতে হইবেই। কিন্তু প্রতি মাসে পাওয়াই বা যাইবে কোথায়? সুতরাং সহ-কারী সম্পাদক মহাশয় নিজেই প্রতি মাসে গান সরবরাহ করিতে লাগিলেন। কোন মাসে নিজের নামে, কোন মাসে কল্পিত কোনও মহিলার নামে। "চাঁদের আলো"র সহিত জড়িত বন্ধুরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল হিরণের গানের এই হিড়িক দেখে। এ ধরণের গান ছাপিয়া মিছামিছি জায়গা নষ্ট করা যায় না। একি উদ্ভট খেয়াল! অবনীও অবশ্য একদিন হিরণকে এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু হিরণ সেটুকু গায়ে মাখিলো না। অথচ "চাঁদের আলো"তে হিরণ-মার্কা গানের প্রবাহ বন্ধ না করিয়াও উপায় নাই। সুতরাং উপায় একটা ঠিক করিল অবনী।

সেদিন সকালের পড়াশুনা শেষ করিয়া কলেজে যাইবার পূর্ব্বের যে অবসরটুকু সেই সময় দেখা গেল অবনী বসিয়া গিয়াছে পুরাণ কতকগুলি মাসিক পত্রিকা লইয়া। নানা ধরণের পত্রিকা ঘাঁটিয়া একখানা সে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল— "যাক্ এতেই হবে।"

সেইদিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া অবনী মহা উৎসাহে সকালের নির্ব্বাচিত বইখানি সামনে রাখিয়া কি যেন লিখিতে বসিল। লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় তার "চাঁদের আলোর" কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। হিরণ তখনও আসে নাই। অবনী অসমাপ্ত অংশটা তাড়া-তাড়ি লিখিয়া ফেলিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল— "দেখ ভাই কেমন মজা, এবার একটা সুন্দর উপায় বা'র করা গেছে।"

বন্ধুর দল একসঙ্গে কাগজটার উপর ঝুঁকিয়া দেখিলো তাহাতে প্রথমেই লেখা রহিয়াছে—আগামী সংখ্যা "চাঁদের আলো"র জন্য হিরণের প্রেরিত গানটি। তারপর নীচে সেই গানের এক স্বরলিপি। প্রথব বলিল—"এতে আর এমন কি মজা রয়েছে? একেতে হিরণ গান লিখে লিখে আত্মগরিমায় ভরপুর তার উপর মেহনৎ করে তার গানের স্বরলিপি লিখে দিলে সে ত আরো উৎসাহ পাবে।"

অবনী খুব এক চোট হাসিয়া বলিল—"এইটুকুই ত মজার শেষ নয় ভাই—আরো কত মজা আছে এর পেছনে। আমার ছোট মামা থাকেন কাশীপুর —তাঁর বাড়ীর ঠিকানা থেকে আমাদের "চাঁদের আলো" কার্য্যালয়ে এই স্বরলিপিটী পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে থাকবে একটুক চিঠি। ধর যেন কোন পুষ্পরেণু দেবী লিখেছেন হিরণের রচিত গান তার খুব ভাল লেগেছে। সেইজন্য তিনি এই স্বরলিপি রচনা করেছেন, তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষক স্বরলিপি দেখে দিয়েছেন, কাজেই তাতে কোন ভুল না থাকবারই সম্ভাবনা। যদি আমরা অনুগ্রহ করে এটা ছাপি, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম। তারপর ঘটনা-চক্রে কি ঘটে দেখতে পাবে। তবে চিঠি আর এই স্বরলিপিটা মেয়েলি হাতের লেখা হলেই ভাল হোত।"

মনীশ বলিয়া উঠিল—"তার জন্য আর ভাবনা কি। আমার বোন অনিতাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই চলবে।"

দিন দুই পরে কাশীপুর হইতে পুষ্পরেণু দেবীর প্রেরিত এক চিঠি ও স্বরলিপি আসিল "চাঁদের আলো"

কার্য্যালয়ে। চিঠি পাইয়াই অবনী হিরণকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ ত আবার কি এল? এ মাসে ত আর জায়গা হবে না মনে হচ্ছে।"

খামের ভিতরের জিনিষগুলি দেখিয়া হিরণ আনন্দে আত্মহারা—"দেখ ভাই তোমরা আমার গানের কত সমালোচনা কর,—আর কাশীপুর থেকে পুষ্পরেণু দেবী আমার গানের স্বরলিপিই রচনা করে পাঠিয়েছেন। এটা কিন্তু এ মাসে ছাপতেই হবে।"

অবনী বলিল—"এ মাসে ছাপতেই হবে এমন কি কথা আছে। আসছে মাসে ছাপলেই চলবে—তাছাড়া ও স্বরলিপি ঠিক আছে কি না তাই বা কে বলতে পারে।"

এ রকম কথা হিরণ কখনও সহিতে পারে না। সে ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল—"ঠিক নেই মানে? যে একটা স্বরলিপি লিখেছে সে গান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খুব সমঝদার। তার উপর সেটা সঙ্গীত শিক্ষককেও দেখান হয়েছে। তার মধ্যে ভুল থাকিলেই হল? নিজে ত তুমি এ বিষয়ে এক নম্বর পণ্ডিত। কাজেই ও আগোচনা তোমার সঙ্গে চলতেই পারে না। আর এ মাসে ওটা ছাপতেই হবে, বরঞ্চ সুনীল বোসের "কয়লার আত্মকাহিনী" প্রবন্ধটাই এ মাসে বাদ দাও।"

সেই মাসের "চাঁদের আলো"তেই পুষ্পরেণু দেবীর স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে সাব্যস্ত হইল। হিরণ ইত্যবসরে "চাঁদের আলোর" পুরাণো এক সেট কাগজ ও তার সঙ্গে ছোট একটুকরা চিঠি লিখিয়া পুষ্পরেণু দেবীকে কাশীপুরের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল। চিঠিখানির ভাবার্থ এই যে তা'রই আগ্রহে তাঁর স্বরলিপি সেই মাসেই প্রকাশিত হইবে—স্বরলিপিটি অত্যন্ত নির্ভুল হইয়াছে। যাঁর সুরজ্ঞান এত চমৎকার তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনিতে পাইলে সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে—ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নিজের বাড়ীর ঠিকানা টুকুও দিতে ভুলিল না। এবং এটুকু অনুরোধও জানাইয়া রাখিল যে, পত্রিকা কার্য্যালয়ে পাঁচ ভূতের দৌরাত্ম্য, কাজেই ভবিষ্যতে পুষ্পরেণু যেন চিঠিপত্র সহকারী সম্পাদক হিরণ্ময় রায়ের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠান।

হিরণের বিস্ময় আরো বাড়াইয়া দিয়া কিছুদিন পরে তার বাড়ীর ঠিকানাতেই পুষ্পরেণু দেবীর এক চিঠি আসিল। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁর স্বরলিপি প্রকাশের জন্য সে তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। সে তাঁর গান শুনিতে ইচ্ছুক। কিন্তু, কাশীপুরে তাঁর শ্বশুরালয়। সুতরাং সেখানে এরকম প্রস্তাব করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তবে তাঁর পিত্রালয় কাশীঘাটে। সেখানে হয়ত এরকম কিছু করা সম্ভব হইতে পারে। তিনি হয়ত দুই চার দিনের মধ্যেই কাশীঘাটে যাইবেন।

হিরণ কম্পিত হস্তে সেই দিনই আবার একখানা চিঠি লিখিল কাশীপুরের ঠিকানায়। সে তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া লইল। আর বিনীত ভাবে জানিতে ইচ্ছা করিল কবে তিনি কাশীঘাটে আসিবেন, এবং কবেই বা সে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁর গান শুনিতে পাইবে।

পরের দিনই হিরণ তার চিঠির উত্তর পাইলো। পুষ্পরেণু দেবী জানাইয়াছেন—তিনি পয়লা আশ্বিন কাশীঘাট যাইবেন এবং পরের রবিবার দিন হিরণ তাঁর ঠিকানায় বেলা ৪ টার সময় গেলে তিনি তাকে তার রচিত গান গাহিয়া শুনাইবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে রবিবার দিন কাশীঘাটে যাইবার কথা তার আগের দিন অবনী বলিল "হিরণ, কাল রবিবার সবারই ছুটি। প্রণবদের মেসে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। সব খ্যাতনামা লেখকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, অনেকেই আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। বেলা ২ টায় থেকে কাজ আরম্ভ হবে, সন্ধ্যা ছয়টা

পর্য্যন্ত—চাই কি আরও বেশীক্ষণ চলতে পারে।" এ রকম সাহিত্য-সভায় উপস্থিত থাকা হিরণের কাছে লোভনীয় ছিল। কিন্তু ওদিকে আবার কালীঘাটে যাইবার সব ঠিকঠাক, মহা মুস্কিল! হিরণ বললো—"বেশ ত পরের রবিবার দিন ব্যবস্থা করনা কেন? আমি ত এ রবিবারে উপস্থিত থাকতে পারব না।"

অবনী বলিল "আরে তা'ও কি হয়? সব বড় বড় লেখকদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে যে। দিন পরিবর্ত্তন করা আর চলে না। তা'ছাড়া তুমিই বা থাকবে না কেন? তোমাকেই এ ব্যাপারে বেশী প্রয়োজন। তুমি উপস্থিত না থাকলে চলবেই না।"

হিরণ বলিল—"কি কাস ভাই? রিসড়ায় ঠাকুরমার বড় অসুখ। আমাকে দেখতে চাইছেন। রবিবার দিনই ত সেখানে একটু দেখে আসতেই হবে।"

কালীঘাটের যে ঠিকানা হিরণ পাইয়াছিল সেটি প্রণবের এক ভগ্নীপতির বন্ধুর বাড়ী। যথাসময়ে রবিবার দিন হিরণ সেই ঠিকানায় গিয়া হাজির হইল। একজন চাকর তাহাকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর খবর দিতে চলিয়া গেল। বৈঠকখানায় নানা রকম বাদ্যযন্ত্র সুন্দর ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে যেন সেখানে একটি গানের আসর হইবে।

ভৃত্য চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে একজন জিজ্ঞাসা করিল তাহার প্রয়োজন কি। সেও প্রতিনমস্কার করিয়া জানাইল যে সে "চাঁদের আলোর" সম্পাদক হিরণ্ময় রায়। পুষ্পরেণু দেবীর লেখা তাহারের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। সেই সম্বন্ধে তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। যুবক হাসিয়া বলিল—"ও পুষ্প? সে আমার ভগ্নী। সে কাগজে লিখতে আর করেছে তা' ত জানতাম না। আচ্ছা বসুন। আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি।"

হিরণ ব্যাকুল আগ্রহে পুষ্প দেবীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কখন পুষ্পরেণু দেবী আসিয়া পড়েন কে জানে? কিছুক্ষণ পর পর্দ্দাটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। হিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল নমস্কার করিবার জন্য। কিন্তু একি! এযে অবনী, প্রণব, মনীশের দল! তাহাদের যে ২৮নং হ্যারিসন রোডে সাহিত্যিক বৈঠকে যাইবার কথা ছিল…সবটাই কি প্রতারণা?

অবনী হাসিতে হাসিতে হিরণের পিঠে এক চাপড় মারিয়া বলিল—"একি হিরণ, তুমি যে এখানে? ওদিকে তোমার ঠাকুরমার মরণাপন্ন অবস্থা। তোমার রিসড়ায় উপস্থিত না থাকলেই নয়। রিসড়ায় যাওনি?"

করিত পুষ্পরেণু দেবীর ভ্রাতা বলিলেন—"উনি আজ আমার বোন পুষ্পরেণুর নিমন্ত্রিত। গান শুনতে এসেছেন। আপনারা ওঁকে চেনেন নাকি? কি হিরণ বাবু, আমাদের অবনী বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি? প্রণবের সঙ্গেও? একি! উঠছেন যে? গান শুনে যাবেন না।"

হিরণ কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া সোজা ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমতি সুজাতা ঘোষ
প্রবন্ধ—"ইব্‌সেন-সাহিত্য ও নারী-প্রগতি"
৪২৬ পৃষ্ঠা

কুমারী সকিনা কেরামত বি-এ, বি-এস্‌-সি
প্রবন্ধ—"আদর্শ মানুষ"
৪৫০ পৃষ্ঠা

ফাতেমা খাতুন
প্রবন্ধ—"আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার"
৫০৯ পৃষ্ঠা

সলিলা ভট্টাচার্য্য
গল্প—"ঝড়ের দেবতা"
৪৮৫ পৃষ্ঠা

রতন টাটা নারী শিল্প-শিক্ষালয়

[মেয়েদের উপার্জ্জনক্ষম করিবার অভিনব পরিকল্পনা]

মেয়েদের এই সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-শিক্ষালয়টী বোম্বাই শহরে অবস্থিত। বোম্বাইয়ের স্বনাম-ধন্যা দানশীলা পার্শী-মহিলা লেডী রতন টাটা তাঁহার পরলোকগত স্বামীর পবিত্র স্মৃতি স্মরণার্থে এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রাসাদোপম যে বিরাট অট্টালিকায় শিক্ষালয়টীর কাজ চলিতেছে তাহাও লেডী রতন টাটাই দান করিয়াছেন। শিক্ষালয়ের পরিচালন-ভার অর্পিত রহিয়াছে "জরথুষ্ট মণ্ডলে"র উপর। মহিলাদের এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটী দুঃস্থ নারীদের উন্নয়নের জন্য বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় আড়াই শত বালিকা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতেছে। শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে বিবাহিতা নারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। শিক্ষালয়টীর বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষার্থিনীরা সকলেই রীতিমত পারিশ্রমিক পায়; সুতরাং শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা গরীব বাপ বা মাকেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারে। শিক্ষালয়টীর পরিচালনার ও কোনরূপ দোষ-ত্রুটি দেখা যায় না; সমস্ত কাজ এমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলাও এত বেশী যে, বোধ হয় হেন্‌রী ফোর্ডের জগদ্বিখ্যাত মোটর কারখানাতেও তাহা নাই।

জ্যাম ও জেলী বিভাগের একটি দৃশ্য
শিক্ষার্থিনিগণ জ্যাম জেলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উহা প্যাক করিতেছেন।

বিশেষ তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষালয়টী গঠিত এবং পরিচালিত হইতেছে, যথা :—

(১) শিক্ষার্থিনীরা নিজের বা পরিবারের জন্য উপার্জ্জন করিবে।

(২) গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হইবে।

(৩) বিবাহিতা মেয়েরাও অবসর সময়ে কিছু কিছু রোজগার করিবে।

বলা বাহুল্য, তিনটী উদ্দেশ্যই সাফল্য-মণ্ডিতহইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত ভূমিতে নারী শিল্প শিক্ষালয়ের অভাব নাই; কিন্তু বোম্বায়ের এই শিল্প বিদ্যালয়টীর সমতুল্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা সন্দেহ।

শিক্ষাসৌকার্য্যার্থে বিদ্যালয়টিকে কয়েকটী বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগে রন্ধন, ধোপাখানা পরিচালন, সেলাই, সূচীশিল্প, গোশালা (ডেয়ারি) পরিচালন, মিষ্টান্ন তৈরী করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যকরী শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। নিম্নে বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

সূচী-শিল্প বিভাগ
এই বিভাগের মেয়েরা সোনালী সুতা দিয়া সাড়ীর উপর কারুকার্য্য করিতেছেন।

একতালায় রন্ধন বিভাগ অবস্থিত। এ বিভাগটী মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য এখানে তাদের ভিড়ও বেশী। কুসুম-পেলব হাতে যখন বাজন, চাপাটী, লাড্ডু, কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য প্রস্তুত হইতে থাকে—সে এক মনোরম দৃশ্য! পঞ্চাশ জনেরও বেশী ছাত্রী এই বিভাগে কাজ করে। মেয়েদের প্রস্তুত এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে আয়ও হয় যথেষ্ট। এখান হইতে বহু বাড়ীতে, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে, এমন কি শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহে পর্য্যন্ত আহার্য্য সরবরাহ করা হয়। প্রত্যহ তিন শতেরও অধিক ব্যক্তিকে আহার যোগান হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক ৬০৲ টাকা লওয়া হয়। এ বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্য এবং এ সমস্ত প্রস্তুত করিতে ছাত্রীদিগকে বিশেষ কৌশল এবং সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়।

রন্ধনশালার পার্শ্বেই লণ্ড্রি অর্থাৎ ধোপীখানা অবস্থিত। সাধারণ ধোপীখানায় যেমন চারিদিক ধুম এবং বাষ্প উত্থিত হয় এখানে সে সব কিছুই নাই। কারণ ইহা একটী বৈদ্যুতিক ধোপীখানা। ইস্ত্রি করা কাপড় শুষ্ক করা সমস্তই বৈদ্যুতিক তাপে সম্পন্ন হয়। এতদ্‌সংলগ্ন আর একটী বিভাগে 'ড্রাই ক্লিনিং'এর কাজ হয়। দুঃখের বিষয়, এই বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা নিতান্ত কম। দিনমানে পরিশ্রম করিলে বড় জোর এক টাকা রোজগার হয়, অথচ

অন্তপক্ষে সূচীকার্য্য, সেলাই ইত্যাদি বিভাগে মেয়েরা অনায়াসে দৈনিক দুই টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিয়া থাকে।

সূচীশিল্প-বিভাগে মেয়েরা শাড়ীর উপর যে সমস্ত কারুকার্য্য করে তাহা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। এ বিভাগে ছাত্রী-সংখ্যা অনেক; এক একজনের রোজগার মাসিক প্রায় ষাট টাকা। সূচীশিল্প-বিভাগের পাশেই সেলাই বিভাগ। ফিগুহস্তে মেয়েরা যখন সারি সারি সেলাইয়ের কলগুলিতে কাজ করিতে থাকে তখন উহার ঘর ঘর শব্দে সমগ্র শিক্ষালয়টী যেন সজীব ও কর্ম্মময় হইয়া উঠে। কাছেই বড় একটী হল ঘরে মেশিন এম্‌ব্রয়ডারির শিখান হয়, ঘরটী এম্‌ব্রয়ডারির মেশিনে পরিপূর্ণ। এই বিভাগে প্রস্তুত শাড়ীর পাড়, ছেলেদের জামা ইত্যাদি সর্ব্বত্রই উচ্চ-প্রশংসিত।

এখানে বয়ন-শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। এ বিভাগে পদার্পণ করিলে দেখা যায় সমান তালে হাত এবং পায়ের আঙ্গুল চালাইয়া মেয়েরা তাঁতের কাজ করিতেছে। মেয়েরা তাঁতে যে সমস্ত শাড়ীর পাড় বয়ন করে তাহা প্রতি আট গজ চার টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। কলকারখানার যুগে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সুতরাং

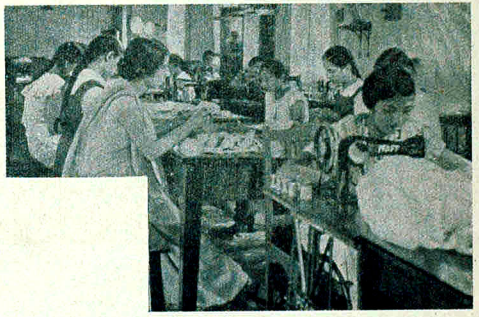

মেশিন্ এম্‌ব্রয়ডারী বিভাগ
সেলাই-কলের সাহায্যে মেয়েরা কাপড়ের উপর নানাপ্রকার নক্সার কাজ করিতেছেন।
এই বিভাগের মেয়েদের কৃতিত্ব শিক্ষিত দর্জ্জীদের চেয়ে কম নয়।

শিক্ষালয়ের মহিলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন—আমরা সত্ত জাপানী পণ্যদ্রব্যকেও হার মানাতে পারি, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়।

ডেয়ারি বিভাগটী বড়ই আনন্দ-দায়ক। কার্য্য-নিরতা, হাস্যবদনা ডেয়ারি-বালিকারা যখন টেবিলের উপর স্তূপাকারে মাখন সজ্জিত করিতে থাকে, সে দৃশ্য বাস্তবিকই ভুলিবার নহে। কী চঞ্চল তাহাদের গতি-ভঙ্গি, কী নিরুপম ব্যস্ততা!

শিক্ষালয়টীর পরিচালন-পদ্ধতিও প্রশংসনীয়। সাধারণের বিদ্যালয়-সংক্রান্ত প্রশ্নাদির উত্তর

লণ্ড্রী বা ধুপীখানায় কার্য্যনিরতা মহিলাগণ

দেওয়ার জন্য অফিস ঘরে সর্ব্বদা একজন মহিলা কর্ম্মচারী বসিয়া থাকেন। শিক্ষালয়ে একটী ছাত্রী-নিবাস আছে, তবে সিট-সংখ্যা খুব বেশী নয়। অভ্যাগত ব্যক্তিদের জন্য অভ্যর্থনা-গৃহেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই আদর্শ শিক্ষালয়টী ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন অবশ্য এখনও অনেক আছে; কিন্তু উদ্যোক্তাগণ যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টীর আয়তন আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং নূতন নূতন বিভাগও পত্তন করা হইবে। সন্তানবতী শিক্ষার্থিনীদের শিশু সন্তানের জন্য নাকি শীঘ্রই একটী শিশু-নিবাস খোলা হইবে। মোটের উপর, ইহা যে ভারতের একটী প্রথম শ্রেণীর নারী শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাহাতে সন্দেহ নাই।

"উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য ঝুরে, অধরে অতৃপ্ত তৃষা জাগে,
আনন্দচঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে
দীপ্ত ক্ষণমণ;
জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল!"

—রাধারাণী

মিসরের মহিলা-প্রগতি

বহু প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী মিসর দেশেও নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তুর্কী নারীর মতো মিসরীয় নারীও সকল বিষয়ে অগ্রগামিণী। মুসলিম জগতে নারী-প্রগতি হিসাবে তুরস্কের পরেই মিসরের স্থান।

চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও মিসর যখন একটী সভ্য দেশে পরিণত ছিল তখন মিসরের মেয়েরা সকল

মিসর-জননী ম্যাডাম্ জগলুল পাশা

বিষয়ে প্রায় পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী কাজকর্ম্ম কোন কিছুতেই প্রাচীন মিসরীয় নারী পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। সে যুগে মেয়েরা রাষ্ট্র-প্রতিভায় কম দেখায় নাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার নাম অনেকেরই পরিচিত। অলৌক-সামান্য রূপ এবং রাষ্ট্র-প্রতিভার অধিকারিণী এই মহিলা রোমক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জগৎব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করেন!

বর্ত্তমান যুগের মিসরীয় নারী আবার সেই অতীত যুগের গৌরব ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ দিকে দিকে আয়োজন হইয়াছে সুউচ্চ নারী-প্রগতির। সন্দেহ নাই, মিসরের মেয়েরা আবার তাহাদের হারাণো গৌরব অতি সহজেই অর্জ্জন করিয়া লইবে।

যে সমস্ত সংস্কার-প্রয়াসী মহিলার আপ্রাণ চেষ্টায় মিসরে নারী প্রগতি আরব্ধ হইয়াছে, ম্যাডাম্ জগলুল পাশা তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া। পরলোকগত জগলুল পাশা যেমন নব্য-মিসরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, ম্যাডাম জগলুল তেমন মিসরীয় নারী-আন্দোলনের অগ্রদূতী ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত্রী। এই মহীয়সী মহিলা এখনও দেশ ও দশের সেবায় বিশেষতঃ নারীদের উন্নয়নের জন্য সাধনায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন।

ম্যাডাম হুদা হানুম চারউই পাশা মিসরের আর একজন কৃতী মহিলা। ইনি সুবিখ্যাত-লা ইজিপ্সিয়ান, নামক পত্রিকার সম্পাদিকা। ম্যাডাম জগলুলের সহধর্ম্মিণী ম্যাডাম জগলুল পাশার পরেই এই মহিলার নাম মিসরের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নারীজাতির উন্নতি-বিষয়ক বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমানে ইনি দি ইজিপ্সিয়ান ফেমিনিষ্ট ইউনিয়ন নামক নারী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটীর প্রেসিডেণ্টের পদে সমাসীন রহিয়াছেন। দেশ-বিদেশ সর্ব্বত্রই ম্যাডাম্ চারউই পাশার

সুখ্যাতি। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ইস্তাম্বুল আন্তর্জ্জাতিক নারী সম্মেলনেও যোগদান করিয়াছিলেন।

ম্যাডাম্ চারউই পাশাও এ-সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র লিখিয়াছেন—

ম্যাডাম্ হুদা চারউই পাশা

মিসরের নারী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেত্রী। বিগত ইস্তাম্বুল আন্তর্জ্জাতিক নারী কন্‌ফারেন্সে ইনি মিসরের নারী-প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। মিসরের সুপ্রসিদ্ধ 'লা ইজিপ্সিয়ান' পত্রিকার ইনি সম্পাদিকা।

বর্ত্তমান মিসরীয় নারী তাহাদের রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ইজিপ্সিয়ান ফেমিনিষ্ট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ম্যাডাম সেজা নারাউই প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ তওফিক নাসিম পাশার বরাবর কতকগুলি প্রস্তাব উথাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রস্তাবে নরনারীর সমান নৈতিক অধিকার, বহু-বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন, এবং নারীর ভোটাধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

"নরনারীর সমান নৈতিক অধিকার-বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটী যে ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বেশ্যাবৃত্তির মত কুপ্রথা দূরীভূত করিবার জন্য যাহাতে শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হয়, সেদিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবটী বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে। ইস্তাম্বুল কন্‌ফারেন্সে ভারতীয় মহিলা-প্রতিনিধিদের আগ্রহাতিশয্যেই এই প্রস্তাবটী গৃহীত

হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সামাজিক কুপ্রথাটী আমাদের দেশ থেকে দূর করিতে চাই। এই প্রথা

প্রিন্সেস্ আব্বাস হিল্মী পাশা

ইনি বহুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইউরোপের অভিজাত মহলে সুপরিচিতা।

বাস্তবিকই অস্বাভাবিক; মহাগ্রন্থ কোরাণেও ইহার বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তবে অবস্থা-বিশেষে অবশ্যই এই প্রথা বলবৎ রাখিতে হইবে। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, চিররুগ্না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বামীকে একাধিক পত্নী বিবাহ করিবার অধিকার দেওয়া প্রয়োজন।"

উপসংহারে ম্যাডাম্ চারউই বলেন—"একথা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয় যে, যুগে যুগে নারীই জাতির অগ্রগতি এবং পুনরভ্যুদয় সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে; মানবতার সেবার কাজেও নারী এইরূপ

কুমারী জাকিয়া সোলেমান

শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎ এই মিসরীয় মহিলাটি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন ভারতবর্ষেও ইনি পদার্পণ করিয়াছিলেন।

অগ্রবর্ত্তিনী। সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ আশা আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় দাবীগুলি পূরণ করিয়া আপনি মিসরীয় নারীকে দেশ এবং মানবতার পূর্ণ সেবার অধিকার প্রদান করিবেন।

যৌবন চলিয়া যাবে, জীবন পশ্চাতে রবে,
বল দেখি, বল দেখি সে মোর কেমনে হবে?
রহিবেনা আশা অভিলাষ!
* * * *
—যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে ক্ষয় জীবন-বসন্ত মোর।

—কামিনী রায়।

কবীরের প্রেম

শ্রীমমতা মিত্র

প্রিয় আমার এলেন সখি
অনেক দিনের পরে.
ভাগ্য ভালো, তাইত তাঁরে
পেলেম আপন ঘরে।
মঙ্গলাচার রাখ্‌রে মনে
পরম সমারোহে—
ভালবাসার রসামৃত
হৃদয়ে যাক্ বহে।
যাঁর পরশে দেউল মম
উজাল হ'য়ে হাসে
প্রাণের প্রভু তিনি আমার —
বসি তাঁহার পাশে।

ওগো আমার হিয়ার নিধি
যুগল আঁখির তারা,
তোমায় লভি' ব্যাকুল আমি—
ঝরে নয়ন-ধারা।
কেমন ক'রে দেব গো মান
তোমায় প্রিয়তম,
ভাবাবেসে চিত্তখানি
আকুল আজি মম।

কবীর কহেন কিছুই ওগো
করি নাই ত' স্বামী,
তোমার প্রেমের পরম প্রসাদ
পেলেম তবু আমি।

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার

ফাতেমা খাতুন

আগুনে পোড়া

আগুনে অথবা গরম তেলে বা গরম জলে পুড়িয়া গেলে দগ্ধ জায়গায় বাতাস করিতে নাই। পোড়া সাংঘাতিক হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। সামান্য পোড়ায় মাতশুড় লেপন করিলে অথবা গোল-আলু বাটিয়া উহার রস লেপন করিলে কিম্বা নারিকেল তেলের সহিত চূণ মিশাইয়া লাগাইলে জ্বালার উপশম হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা পড়ে না। ঘৃতকুমারীর রস লাগাইলেও জ্বালা নিবারিত হয়।

কাপড়ে আগুন ধরিলে উহা লইয়া ছুটা-ছুটি করিলে বিপদ অনিবার্য্য। মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিতে হয়। সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতে হয়। নিকটে কম্বল, কাঁথা কিংবা কোন মোটা কাপড় থাকিলে তাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিবেন। সাবধানে একাজ করিতে হইবে যেন নিজের কাপড় আগুনে না ধরিতে পারে।

ফোস্কা গালিবেন না, গালিলে ঘা হইবার সম্ভাবনা। যদি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রকার ফোস্কা গলিয়া যায় তাহা হইলে চূণের জল ও নারিকেল তেল একত্রে ভালরূপে মিশাইয়া কচি কলা পাতা দিয়া তাহার উপর একটু তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন।

মাথায় আঘাত লাগিলে

মাথার উপরে আঘাত লাগিলে উক্ত স্থানে এক-খানা পরিষ্কৃত পাতলা কাপড় "টিংচার অব আই-ওডিনে" ভিজাইয়া রাখিয়া দিবেন, তৎপর কয়েক ভাঁজ কাপড় গদির মত করিয়া উক্ত ভিজা ন্যাকড়ার উপরে রাখিয়া এটুক জোরে বাঁধিয়া দিবেন।

মচ্‌কাইয়া গেলে

সন্ধিস্থান সাংঘাতিকরূপে মচ্‌কাইয়া গেলে চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য, কারণ আঘাত-প্রাপ্ত স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে।

মচ্‌কাইবার পর প্রথমেই আধঘণ্টা বা একটু বেশী সময় গরম জলে (যতদূর সহ্য হয়) আহত অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিবেন। পরে কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা উক্ত স্থান জোরে বাঁধিয়া দিবেন। যে স্থান মচ্‌কাইয়া গিয়াছে, তাহার নীচু হইতে ব্যাণ্ডেজ করিতে আরম্ভ করিবেন। হাত মচ্‌কাইলে অঙ্গুলীর নিম্নভাগ হইতে কব্জির দিক দিয়া ব্যাণ্ডেজ আরম্ভ করিবেন। পরের দিন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া আহত অঙ্গ আবার পনর- কি বিশ মিনিট কাল গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবেন। গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবার সময় আহত স্থান নীচ হইতে উপর দিক এবং উপর হইতে নীচ দিকে ঘষিতে থাকিবেন। ইহাতেই সাধারণ মচ্‌কানের ব্যথা সারিয়া যাইবে।

হাত-পায়ে পেরেক-বিদ্ধ হইলে

হাত বা পায়ে পেরেক বা বাঁশের কুঁচি বিদ্ধ হইলে, প্রথমে যাহা বিদ্ধ হইয়াছে তাহা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলুন। পরে একটী কাঠের সরু

কাঠিতে তুলা জড়াইয়া উহা টিংচার অব আইওডিনে" ডুবাইয়া চামড়ার মধ্যে যে গর্ত্ত হইয়াছে তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিবেন।

দাঁতের বেদনা

যে দাঁতে বেদনা সেই দাঁতের গোড়ায় বা পাশে কোন ছিদ্র বা ফাঁক থাকিলে প্রথমে উহার ভিতরে সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। অল্প পরিমাণ শোষক তুলায় লবঙ্গের নির্য্যাস (অয়েল অব্ ক্লোভ্স) মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিবেন। দাঁত খুটনী দ্বারা তুলাটুকু ছিদ্রের মধ্যে ভরিয়া দিবেন। অনেক সময় ছিদ্রের মধ্যে "সোডা বাই কার্ব্বনেট" খাবার সোডা ভরিয়া দিলে যন্ত্রণা সারিয়া যায়।

লবঙ্গচুর্ণের সহিত কয়েক ফোঁটা সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া দাঁত পরিষ্কার করিলে উপকার পাওয়া যায়।

লবণমিশ্রিত জল সাধারণ অবস্থায় মুখ ধৌতের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এই জল দ্বারা প্রত্যহ কয়েক বার বিশেষতঃ দুবেলা আহারের পর মুখ ও গলা ধৌত করিলে দাঁত ও মুখের বহুবিধ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চোখে কিছু পড়িলে

চোখের ভিতর কয়লার গুড়া, কুটা বা ধুলিকণা প্রবেশ করিলে কখনও চক্ষু রগড়াইবেন না, অথবা অপরিষ্কৃত কাপড় দ্বারা তাড়াতাড়ি উহা মুছিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন না। রোগীকে স্থিরভাবে বসাইয়া বা শোয়াইয়া চোখের উপরের পাতা উল্টাইয়া ফেলিবেন এবং তাহাকে নীচের দিকে চাহিতে বলিবেন এবং চক্ষু-গোলক ঘুরাইতে বলিবেন। চোখের নীচের পাতাও বাহিরের দিকে টানিয়া ধরিবেন। তাহা হইলে চোখের ভিতরকার জিনিষ পরিষ্কার দেখা যাইবে। পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা উহা আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ফেলুন। ধাতব কণার ন্যায় কোন শক্ত বস্তু আটকাইয়া থাকিলে উহা বাহির করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করিবেন না। জ্বালা পোড়া অবস্থায় চক্ষুর যে জল বাহির হইবে তাহার সহিত স্বাভাবিক রূপে উহা বাহির হইয়া আসিবে। ধাতব কণাদি যদি চোখের কোন স্থান ভেদ করিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ।

ধুলিকণা দূরীভূত হওয়ার পর চোখ রক্তবর্ণ ও ব্যথাযুক্ত হইলে ফটকিরি মিশ্রিত জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চোখে দিলে উপকার হইবে। ডাক্তারগণ বেদনা কমিবার জন্য চক্ষে কয়েক ফোঁটা "বোরিক সলিউসন" দিয়া থাকেন।

কাণে কিছু প্রবেশ করিলে

কাণে জল ঢুকিলে সে কাণটা কাত করিয়া নীচের দিকে রাখুন এবং বিপরীত দিকের অন্য কাণের কাছে মাথার ধারে ধারে আঘাত দিন, জল বাহির হইয়া যাইবে। কাণে ছোট পোকা বা পিপড়া ঢুকিলে সহ্য হয় এরূপ গরম করিয়া কয়েক ফোঁটা সরিষার বা নারিকেল তেল দিন, পোকা মরিয়া যাইবে। তারপর উহা বাহির করিয়া ফেলুন।

নাক ও গলায় ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কারণে অনেক সময়ে কাণে বেদনা হয়। বিছানায় শয়ন করিয়া গরমজল পূর্ণ বোতল বা রবারের ব্যাগের উপর যে কাণে বেদনা সেই কাণ রাখিয়া দিবেন। অথবা ফ্লানেল কিম্বা পরিষ্কার তুলা গরম করিয়া সেক দিবেন। বার ঘণ্টা বা তার অধিক কাল কাণে বেদনা থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

কাণে তালা লাগিলে খুব জোরের সহিত নিঃশ্বাস লইতে হয়। নাক মুখ বন্ধ করিয়া নিঃশ্বাস লইবার চেষ্টা করিলে কাণের তালা ছাড়িয়া যাইবে।

নাকে কিছু প্রবেশ করিলে

যে নাকটীতে কিছু প্রবেশ করে নাই সে নাকটী টিপিয়া ধরিয়া খুব জোরে হঠাৎ নিঃশ্বাস ছাড়িবেন।

নাকে কাঠি দিয়া হাঁচিবেন। যদি ইহাতেও বাহির না হয় তবে শোন্না দিয়া জিনিষটাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ফেলিবেন। খোঁচা দিয়া যেন উপরের দিকে ঠেলিয়া দিবেন না। অল্প চেষ্টায় বাহির না হইলে অনেকক্ষণ খোঁচা খুঁচি করিবেন না, উহা আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিবে।

নাকে জোঁক ঢুকিলে জলে লবণ গুলিয়া সেই জলের নস্য লইলে জোঁক বাহির হইয়া আসিবে।

মাথার উকুণ

মাথায় উকুণ হইলে পরিষ্কার সাদা কেরোসিন এবং বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল সমান অংশ একত্র মিশাইয়া বৈকাল বেলা ২।৩ দিন দিবেন। দুই তিন দিন দিলেই চলিবে। চুলে উক্তরূপ মিশ্রিত তৈল দিয়া একখানি কাপড় জড়াইয়া রাখিবেন এবং সকাল বেলা গরম জল ও বিশুদ্ধ সাবান-দ্বারা মাথা ধুইয়া ফেলিবেন। উক্ত তৈল মাথায় দিয়া প্রদীপ আগুনের নিকট যাইবেন না।

ছারপোকা

ছারপোকা কতিপয় সাংঘাতিক রোগের বিস্তার করিয়া থাকে। বিছানা ও কাপড় চোপড় ভালরূপে সিদ্ধ করিলে উহারা বিনষ্ট হয়। চৌকী বা খাটের ফাটলে বা ছিদ্রে ছারপোকা থাকিলে এক-ভাগ কার্ব্বলিক এ্যাসিড, দশভাগে জলে মিশাইয়া ফাটলে ও ছিদ্রে দিবেন। তার্পিন তৈল লাগাইলেও উক্ত কার্য্য সাধিত হয়।

গলায় কিছু বাধিলে

মাছের কাঁটা, ডাঁটা প্রভৃতি গলায় বাধিলে শুক্‌নো ভাতের মুঠো পাকাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হয় এবং তাহার সহিত একটু ঘি মাখাইয়া লইলে ভাল হয়। পাকা কলা খণ্ড খণ্ড করিয়া চটকাইয়া বা না চিবাইয়া আও গিলিয়া ফেলিবেন। কোন ধাতুদ্রব্য, পেটের মধ্যে প্রবেশ করিল কোন প্রকার অম্ল দ্রব্য খাইবেন না। অম্ল খাইলে গলিয়া শরীরে বিষ ক্রিয়ার সঞ্চার হইতে পারে।

বোলতা বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে

মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ও কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে নথ বা সরু শলা অথবা ফাঁকা চাবি দ্বারা হুলবিদ্ধ স্থান চাপিয়া ধরিলেই হুলটা ঠেলিয়া বাহির হইবে। হুল না বাহির করিলে দংশিত স্থানে ঘা হইতে পারে। গুড় বা মধু লাগাইলে উপকার হইবে। পিয়াজের রস বা কেরোসিন তৈল বার বার মালিস করিলে ফল পাওয়া যায়। বকুল বীজ অথবা তাহার অভাবে বকুল ছাল পাথরে ঘষিয়া কাদার মত করিয়া দষ্টস্থানে উহা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ছ্যাঁকা দিলে বিছা প্রভৃতির দংশনের তীব্র যন্ত্রনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

স্বাস্থ্য ও শক্তি

মেয়েদেরও যে খেলা ধুলা এবং অঙ্গ-পরিচালনের প্রয়োজন, এ সহজ সত্যটী অনেকেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এমন কি, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত নারীর এই জন্মগত দাবী এবং অধিকারটী একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী।

কুমারী পূর্ণ ঘোষ
কলিকাতার এই মেয়েটী খেলা ধুলায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি অনেকগুলি কাপ এবং অন্যান্য পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্য সকল সম্পদের মূল। যাহাদের উপার্জ্জন করিয়া সংসার বা নিজেকে প্রতিপালন করিতে হয় তাহাদের নিকট স্বাস্থ্যই একমাত্র অবলম্বন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্য্যোগের আমলে নর-নারী সকলকেই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইতেছে; সুতরাং মেয়েদের পক্ষেও স্বাস্থ্যরক্ষা সমান প্রয়োজন। পুরুষদের মতো মেয়েদেরও শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ বিকশিত, মাংসপেশী সমূহ শক্তিশালী এবং দৃঢ়-সংবদ্ধ করিতে হইবে। দেহযন্ত্রকে এইভাবে সুস্থ এবং সবল রাখিতে হইলে খেলা-ধুলা এবং রীতিমতো ব্যায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। সুতরাং নারীকে কেবল মাত্র দর্শক সাজিয়া হাততালি দিলে চলিবে না; তাহাকেও শরীরচর্চ্চায় যোগদান করিতে হইবে।

খেলাধুলা এবং ব্যায়ামচর্চ্চার স্বাস্থের জন্য যে কতখানি মঙ্গলপ্রদ তাহা পাশ্চাত্য জগতের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। তথাকার মেয়েদের স্বাস্থ্যমণ্ডিত দেহের যে অপূর্ব্ব সুষমা তাহা ব্যায়াম অভ্যাস এবং খেলাধূলার কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিলাতের মেয়েদের শরীরের দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর আমাদের দেশের নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই তাহাদের আকার অবয়ব যেন ক্রমশঃ হৃতস্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইতেছে। শরীরের রক্তের লেশ নাই, পাণ্ডুর মুখে বিমর্ষতার করুণ ছবি। দেহযন্ত্র যেন আর চলে না। বোতল বোতল পাচন আর এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী-হাকিমী ঔষধ সেবন করিয়া তাঁহারা কোনরূপে তিষ্ঠিয়া আছেন। বংশধরগণও জননীদের এক একটা প্রতিচ্ছবি। তাহাদেরও গতি নিয়মুখী। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় জাতি যে কতদিন টিকিয়া থাকিবে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

এই প্রহেলিকাময় দারুণ পরিস্থিতির বিলোপ সাধনের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একমাত্র কার্য্যকরী খেলা ধূলার প্রবর্ত্তন আশু অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র দেহযন্ত্রকে সুস্থ, সবল এবং কার্য্যক্ষম রাখার পক্ষেই যে খেলা-ধুলার প্রয়োজন তাহা নহে; দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বাস্থ্যও অটুট থাকিবে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিও জাগ্রত হইবে। এইখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আমাদের দেশে মেয়েদের ত আর অফিস-আদালত বা কল-কারখানায় যোগদান করিতে হয় না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে আবার খেলা-ধুলার হাঙ্গামা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, নারীকে যদি কেবলমাত্র ঘর সংসারের ক্রীতদাসী এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপেও কল্পনা করা হয়, তবুও তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খেলাধূলায় যোগদান বাঞ্ছনীয়। কারণ একমাত্র স্বাস্থ্য-সুষমা-মণ্ডিত

নিজেকে সবল ও সতেজ রাখিবার জন্য সুন্দরী মিস্ ফ্রান্সিস লাঠির সাহায্যে প্রত্যহ নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

গৃহলক্ষ্মীই গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে পারে। স্বাস্থ্যবতী মায়ের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিও সুস্থ সবল হইয়া থাকে।

খেলাধূলার আরও একটা দিক আছে। খেলাধূলার ভিতর দিয়া মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী হইয়া উঠে। ক্রীড়ার সময় পাঁচজনের সঙ্গে মিশিতে মিশিতে মানুষের সামাজিক দিকটাও বিকাশিত হইবার সুযোগ পায়। এইজন্য শিশুদেরও ক্রীড়াক্ষেত্রে সমবেত করিবার প্রয়োজন। ক্রীড়াক্ষেত্রের শিক্ষা নিতান্ত কম নয়। খেলোয়াড়ী মনোভাবটা যদি শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারা যায় তাহা হইলে অনাগত ভবিষ্যতের দারুণ দুর্দ্দিনগুলির জন্য তারা এমন ভাবে তৈরী হইয়া উঠিবে যে সামান্য আঘাতেই তাহারা মুষড়িয়া পড়িবে না।

মিস্ ডরোথী রাউণ্ড, জি, বি

(ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বৎসরের মহিলা টেনিস চ্যাম্পিয়ান। ১২৩১ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উইম্বলডন কাপ প্রতিযোগিতায় বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বহুস্থানের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী আখ্যা লাভ করিয়াছেন।)

এগার-বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের খেলাধূলা এবং ব্যায়াম-চর্চ্চা একই রকমের হওয়া প্রয়োজন। বার বৎসরের পর ছেলেদের অস্থি এবং মাংসপেশী সমূহ এরূপ দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে যে, মেয়েদের পক্ষে তখন আর ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এখন জিজ্ঞাস্য, ছেলে এবং মেয়েদের খেলাধূলা একই রকমের হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না?

এইস্থানে নারীর দৈহিক গঠন এবং সমাজ-দেহে নারীর স্থান সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। প্রাণ-বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, পুরুষদের চেয়ে নারীর স্বাস্থ্যের মূল্য বেশী। বংশধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে নারীরই দায়িত্ব বেশী। ফুটবল, হকী প্রভৃতি বহুশ্রম-সাপেক্ষ খেলায় নারীর যোগদান না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, এই সমস্ত খেলায়, হাত পা ত ভাঙ্গেই, অনেক সময় জীবনও বিপন্ন হয়। সুতরাং এই সমস্ত ভারী খেলা অনেক সময় মাতৃত্ব-বিকাশের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে।

আরও একটা কারণ বশতঃ নারীর বহুশ্রম-সাপেক্ষ ব্যায়ামাদিতে যোগদান না করাই বাঞ্ছনীয়। নারী কোমল-স্বভাবা; তাহার বোধশক্তিও তীব্রতর। এইজন্য নারীর স্নায়ুমণ্ডল অধিকতর বিকশিত। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্নায়ুসমূহ নারীদেহের অভ্যন্তরে এরূপ ওতোপ্রোত বিজড়িত রহিয়াছে যে, অত্যধিক দৈহিক শ্রমে স্নায়ুমণ্ডল বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। ইত্যাদি কারণে নারীর অত্যধিক শ্রমের কাজকর্ম্ম এবং ভারী খেলাধূলা হইতে বিমুখ থাকাই ভাল। প্রত্যেক মেয়েকেই রীতিমতো চিন্তা করিয়া খেলাধূলা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, এবং কতক্ষণ খেলা তাহার পক্ষে ভাল তাহাও তাহাকে বুঝিতে হইবে।

প্রয়োজন মত খেলাধূলা এবং ব্যায়ামচর্চ্চা নারীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইহাতে মেয়েরা অনেক রোগের আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাইবে।

যে সমস্ত মেয়ে খেলাধূলা, ব্যায়াম-চর্চ্চা ভালরূপে শিখিতে চায় তাহাদের পক্ষে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া কাজ আরম্ভ করা ভাল। খেলোয়াড় মেয়েদের বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ডাক্তারের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। মেয়েদের মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষদের চেয়ে তাহাদের শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি অনেক কম। সুতরাং কঠিন খেলার সময় তাহারা যেন পুরুষদের অতিক্রম করিবার দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। পুরুষরা যে পরিমাণ দৈহিক শ্রম করিতে পারে নারী তাহার প্রায় তিন-চতুর্থাংশের অধিকারিণী। সুতরাং নারীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় খেলা করা ভাল। খেলাধূলার নিয়ম-কানুনও মেয়েদের খুব বেশী পালন করা দরকার। ভবিষ্যতে তাহারা সন্তানের জননী হইবে এইজন্য খেলাধূলা এবং ব্যায়াম-চর্চ্চায় মেয়েদের এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।

আমারে ডেকোনা বন্ধু

—আজিজুন্নেছা খাতুন

আমারে ডেকোনা বন্ধু তোমার ও সুখময় পথে,
উদার মুক্তির মত বন্ধহীন দুঃসহ আলোতে।

যে পথে মেলেনি' ছায়া, কালো মেঘ স্নিগ্ধ করুণায়,
আকাশ ব্যথিয়ে ওঠে আলোকের রূঢ় উগ্রতায়।
আমারে ঘিরিয়া চলে, সাহারার অতৃপ্ত বাতাস—
ধূসর পথের পরে এলোমেলো ধূলির উচ্ছ্বাস।
আঁখিতে নিভিয়া গেছে কামনার উজ্জ্বল আবেশ,
বিস্ময় আনে না চোখে; তাই মম সব স্বপ্ন শেষ।
নিমন্ত্রণ পাই নাই কভু বনানীর ছায়ার উৎসবে,
আচ্ছন্ন ক'রেছে ব্যথা ধূলিম্লান চোখের পল্লবে।
কুহেলীর আবরণে ঢাকিয়াছে ধরণীর রূপ,
উগ্রতর পুড়িতেছে আমার এ জীবনের ধূপ।

তাপদগ্ধ জীবনেতে নাচে নাই আনন্দময়ীর
তুমি মোরে শুধায়োনা এ পথের শেষ কত দূর।

—:০:—

সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা

রূপ ও ছবি

সমাজ জীবনের সেই আদিম যুগ হইতে নারী সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে এবং আপনাকে সে সমানভাবে নানারূপে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে। আপনাকে লইয়া এই যে তাঁর রূপ-সৃষ্টি—সমাজের অন্যান্য সৃষ্টি ও সাধনার ন্যায় ইহাকেও চলিতে হইয়াছে অসংখ্য পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ধারা বাহিয়া। আজ যে নারীকে আমরা সৌন্দর্য্যের প্রতীক-রূপে দেখিতে পাইতেছি—

মুখের গঠন-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির যন্ত্র

আমেরিকায় এই নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পছন্দ মত মুখের আকৃতি গঠন করা যাইবে। ক্রমান্বয়ে কিছুকাল ছাঁচ অনুযায়ী মেসিনের চাপ মুখে লইলে, তদনুযায়ী মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

ইহার গোড়ায় রহিয়াছে বহু-যুগের সৌন্দর্য্য-সাধনা। কিন্তু, নারীর এই রূপ-সৃষ্টির শেষ আজও হয় নাই। আজও তাহাকে নিত্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উপাদান হিসাবে কাল যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল আজ আবার তাহাকে বর্জ্জন করা হইতেছে। এবং আজ যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছিল হয়তো ভবিষ্যতে তাহাকেও আবার বর্জ্জন করিতে হইবে। এমনি করিয়া নিত্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গোটা মনুষ্য সমাজ এক বৃহত্তর সৌন্দর্য্য বিকাশের পথে চলিয়াছে। সৌন্দর্য্য চিরকালই মানুষের জীবনে আনন্দের বস্তু—যদিও সৌন্দর্য্যের ধারা সম্বন্ধে অনেক রুচি-ভেদ দেখা যায়। যাহা কিছু সুন্দর স্বভাবতঃই তাহা আমাদের মনে একটা আকর্ষণের সৃষ্টি করে এবং আনন্দের সহিত সেই সৌন্দর্য্যের একটা মূল্যও আমরা দিয়া থাকি। কিন্তু, মানুষের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে তাহারও অদ্ভুত রকমের একটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন চিনের লোকেরা সুন্দরী ক'নের চাইতে কুৎসিত ক'নের মূল্যটাই বেশী নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া সব চাইতে কুৎসিত মেয়েদিগকেই তাঁরা পত্নীত্বে বরণ করেন। সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রেও এমনি রুচি-বিপর্য্যয় দেখা যায়।

সহস্র প্রকার রুচি-বিপর্য্যয় থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্য্য জিনিষটা জীবনের পরম আনন্দের বস্তু। আর এই সৌন্দর্য্যকে রূপ দেওয়ার উপায়ই তাহার চর্চ্চা করা। তাই দেখিতে পাই বর্ত্তমানে নানাভাবে নানা প্রকারে নারীর সৌন্দর্য্য চর্চ্চার সাধনা চলিয়াছে।

আগেকার দিনে নারী তাঁর স্বভাবপ্রদত্ত দেহখানা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত—তা' সেই দেহ

সুন্দরই হোক কিম্বা অসুন্দরই হোক। আজ কিন্তু তাহাতে আর সে সন্তুষ্ট নাই। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজের দেহকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে সে সর্ব্বদা তৎপর।

নূতন ডিজাইনের ব্লাউজ
সোনালী পাড়ের বেনারসী শাড়ীর সহিত ইহা বেশ মানায়।

অভিজ্ঞদের মতে নারীর যত প্রকার পোষাক আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে শাড়ীই নাকি সব চাইতে কবিত্বপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যের পরিবর্দ্ধক। দেহের উপর রূপের একটা চমৎকারিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে শাড়ীই অদ্বিতীয়। তাই ইদানিং শাড়ীর প্রতি সকলেরই একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। কিছুকাল আগে এক মাত্র বেনারসী ব্যতীত সাধারণতঃ সাদাসিধে ধরণের শাড়ীর প্রচলন হইত। কিন্তু আজ তাহার স্থানে দেখা যায় নানা রঙ্গের নানা রূপের বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত শাড়ীর প্রবর্ত্তন। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় শাড়ীর মনান-সই ব্লাউস্ ও ব্লাউজের প্রচলন। আবার অন্যদিকে জুতোও ঠিক শাড়ীর সাথে খাপ খাওয়াইয়া তৈরী হইতে শুরু হইয়াছে। শাড়ী পরিবার ধরণ ও অনেক রকম দেখা যাইতেছে।

শাড়ী যেমন নারীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের পক্ষে একটা চমৎকার জিনিষ, অলঙ্কারও ঠিক তাহাই। মণি-মুক্তা, চুণী-পোখরাজ, হিরা-নীলমণির অপূর্ব্ব চাকচিক্য রমণী দেহের উপরে এমন একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে যাহা মানুষের মনকে আকর্ষণ না করিয়া পারেনা। কিন্তু, এই অলঙ্কার সম্বন্ধেও ক্রমেই রুচি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। আগেকার দিনে যে ধরণের অলঙ্কার পরা হইত আজকাল আর তাহা হয় না। নারীর-সৌন্দর্য্য রুচির সঙ্গে সঙ্গে তার অলঙ্কারগুলিও অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। নারী এখন নিত্য নূতন রূপ-সৃষ্টির পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত।

আগেকার দিনে মেয়েরা তাহাদের মাথার কেশ সম্বন্ধে এক প্রকার হতাশ হইয়াই দিন কাটাইত। চুল কোঁকড়ানো হইত কি সোজা হইত, কোমল হইত কি কর্কশ হইত—তাহাতে তাহাদের কোন হাত ছিল না। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ তাহাদের যে রূপ ইচ্ছা ঠিক তেমনটি করিয়া তাহারা বেশের একটা রূপ দিতে পারে। এবং নিজ নিজ রুচি অনুসারে চুলের সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিতে পারে।

সুন্দর কেশের প্রতি স্বভাবতঃই মেয়েদের একটা আকর্ষণ দেখা যায়। বিশেষ করিয়া ঢেউ-খেলানো চুলের প্রতিই তাহাদের আগ্রহ দেখা যায় বেশী। লম্বা এবং খাট চুল সম্বন্ধেও একটা রুচি-বিপর্য্যয় দেখা যায়। প্রাচ্য জগতের মেয়েরা স্বভাবতঃ লম্বা চুলকে সৌন্দর্য্যের পরিবর্দ্ধক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতের অনেক কিছু ঢেউ আমাদের দেশে

গাঢ় লাল রঙের জর্জ্জেট শাড়ীর উপর সোনালী সুতা ও চুমকীর কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর।

আসিয়া লাগা সত্ত্বেও লম্বা চুলের প্রবর্ত্তন এখনও ভারতীয় নারী-সমাজের টিকিয়া আছে। ইদানিং ছোট চুলের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিবার উপায় হইতেছে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করা। রূপ-চর্চ্চার অভাবে রূপসীকেও কুরূপা দেখাইয়া থাকে। আর অন্যদিকে রূপ চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কুরূপা রমনীও সুন্দরী হইয়া উঠে।

পাউডার মাখানো গালে গোলাপী রঙের ঈষৎ আভা ফুটাইয়া তোলা, ঠোঁট দুটোকে রাঙিয়ে লাল টুকটুকে করা—তারপর দু'টো ভ্রূ চিকন করিয়া আঁকিয়া তাহাতে কালো রঙের ঈষৎ ছোপ লাগানো এমনি করিয়া যে রূপের সৃষ্টি হয় হোক তাহা কৃত্রিম, কিন্তু তবু তাহা সুন্দর। ইহা ব্যতীত নারীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ব্যাপারে সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যও একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। সুগন্ধি দ্রব্যের এমনি একটা নিবিড় সম্মোহন-শক্তি আছে যে তাহা অতি সহজেই মানুষের মনকে এক অপূর্ব্ব পুলকে মাতাইয়া তোলে—এবং স্বভাবতঃই তাহাকে একটা সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে মশ্‌গুল করিয়া তোলে।

কৃত্রিম উপায় ব্যতীতও নারীর সৌন্দর্য্য-সাধনার অন্য উপায় আছে। সে হইতেছে সহজ সৌন্দর্য্যের সাধনা। অনেকের মতে নারীর কৃত্রিম রূপ-সৃষ্টি তাহার সহজ-সৌন্দর্য্য বিকাশের পথে মস্ত বড় অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতার" "মিস্ কেটীর" ব্যাপারে দেখা যায় যে কৃত্রিম উপায়ে যদিও সে একটা চাকচিক্যপূর্ণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে—তবু সেই রূপ চোখেই কেবল সুন্দর লাগে, কিন্তু, মনকে তাহা আকর্ষণ করে না মোটেই। সে যখন কাঁদে—তাহার স্নো ও পাউডার-চর্চ্চিত গণ্ড বাহিয়া যখন অশ্রু গড়াইয়া পড়ে—তাহা দেখিতে বেশ লাগে। কিন্তু ভালোবাসায় তাহা কখনও কাহার মনকে অভিষিক্ত করিয়া তোলে না।

কৃত্রিম উপায়েই হোক আর সহজ-সৌন্দর্য্যের চর্চ্চার ভিতর দিয়াই হোক—বিশ্বের নারী-সমাজ বিরাট এক রূপ-সৃষ্টির পানে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীমমতা মিত্র
কবিতা - "কবীরের প্রেম"
৫৮০ পৃষ্ঠা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
কবিতা—"আহুতি"
৪৪২ পৃষ্ঠা

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী
গান – ৪৪৮ পৃষ্ঠা

...আজিজুন্নেছা খাতুন
...ডকনা বন্ধু"
...পৃষ্ঠা

সাময়িকী

বৈজ্ঞানিক ম্যাডাম কুরী

'রেডিয়াম' আবিষ্কার-কারিণী ম্যাডাম্ কুরী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী বৈজ্ঞানিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরুষ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও ম্যাডাম কুরীর সমকক্ষ খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ দুইবার নোবেল প্রাইজ লাভ এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষ বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথম বার অবশ্য ইনি এই প্রাইজ পান স্বামীর সমভিব্যাহারে; কিন্তু দ্বিতীয় বার তিনি একাই এই দুর্লভ গৌরব

বৈজ্ঞানিক ম্যাডাম কুরী

লাভ করিয়াছেন। রেডিয়াম আবিষ্কারে মসিয়ে কুরী (ম্যাডাম কুরীর স্বামী) সহ[illegible] কিন্তু রেডিয়াম অপেক্ষাও শক্তিশালী ধাতু—পলোনিয়াম তিনি একাই আবিষ্কার করেন।

ম্যাডাম কুরী ১৮৬৭ সালে পোলাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ার্সা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক। পিতার নিকট তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাতে খড়ি হয়। তারপর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহাকে দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া প্যারিসে আগমন করিতে হয়। প্যারিসে নানাপ্রকার ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর তাঁহার ভাবী স্বামী মসিয়ে কুরীর সহকারী রূপে একটী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ইনি নিযুক্ত হন। ক্রমে ইঁহারা দুইজনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। মসিয়ে কুরী এখন পরলোকে। কিন্তু ম্যাডাম কুরী এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমজ্জিতা।

ম্যাডাম্ কুরীর মেয়ে ম্যাডাম কুরী জোলিয়ো যোগ্যা মায়ের যোগ্যা তনয়া। ইনিও স্বামীর সহিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ম্যাডাম কুরী যেমন রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া জগৎ-বিখ্যাতা, ইনিও তেমনি কৃত্রিম রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। আরও সুসংবাদ এই যে, ইনিও এই বৎসর রসায়নের জন্য নোবেল প্রাইজ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী মসিয়ে জোলিয়ো প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মা ও মেয়ে উভয়ের নোবেল প্রাইজ পাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই।

—:—

নারী ও শাসন-সংস্কার

বেগম শাহ্‌নওয়াজ বর্ত্তমানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে তিনি আর একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে একজন পর্দ্দানশীন মহিলা।

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্র-প্রতিনিধির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারও হইয়াছে। ইঁহাদের সহিত আলোচনা কালে তিনি আগত শাসন-সংস্কারে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে বলেন যে, মেয়েদের ভোট-দানের যোগ্যতা সম্বন্ধে পৃথক যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে তিনি তাহার পক্ষপাতী নহেন। ব্যক্তিগত যোগ্যতা হিসাবেই নারীর ভোট প্রদানের অধিকার থাকা উচিত। কাহারও পত্নী বা ভগিনীরূপে নারীর ভোট-দানের অধিকারিণী হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আইন-সভা-সমূহে নারী-সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ইনি বলেন, নারীদের জন্য মুষ্টিমেয় যে কয়টী আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার জন্য বৃটিশ রাজনৈতিকগণ দায়ী নহেন; গোলটেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিগণই নারীর প্রতি এই অবিচার করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য দুইজন মহিলা প্রতিনিধির কথা উত্থাপন করা হয়; কিন্তু ঐ প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একজন মহিলা প্রতিনিধি নিয়োগও সমর্থন করেন না। বাংলার ভদ্রমহোদয়গণ আপন প্রদেশের জন্য মাত্র পাঁচজন নারী-সদস্যের পক্ষপাতী হন; বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাংলার জন্য সেই পাঁচজন মহিলা সদস্যেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারতের নারী সমাজ সম্পর্কে ইনি বলেন যে, এদেশের মেয়েদের দাস-মনোভাব তাহাদের নিজের এবং দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে; পুরুষগণ যদি ইহা দূরীভূত করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে দেশের কোনই আশা-ভরসা নাই। মুসলিম নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ইনি বলেন যে, ইহারা এক দারুণ বিভীষিকার রাজ্যে অবস্থান করিতেছে; উপরে খোদাতালা, আর নীচে পুরুষ মুসলিম নারীর মনে ভীতি উপস্থিত করিয়া দণ্ডায়মান। ইসলাম কিন্তু আদৌ এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সমর্থন করে নাই।

—:—

গুলজার বেগম

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেসন অফিসসমূহের ইন্‌স্পেক্টর, খান বাহাদুর মৌলবী ফজলুল কাদির সাহেবের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী গুলজার বেগম সাহেবা তাঁহাদের চট্টগ্রাম-চন্দনপুরাস্থ আবাসবাটীর সংলগ্ন

গুলজার বেগম

পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড প্রশস্ত জমি একটী মুসলিম মধ্য-ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপ[illegible] করিয়াছেন। উক্ত জমির উপর

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বালিকা বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বেগম সাহেবার নামানুসারে বিদ্যালয়টীর নাম রাখা হইয়াছে—"গুলজার বেগম গার্লস, এম, ই, স্কুল"। বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ টাকা, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী মাসিক ১৫০৲ টাকা, ইসলামবাদ টাউন ব্যাঙ্ক মাসিক ৫০৲ টাকা, এবং চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য করিতেছে। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে ১২৫ জন ছাত্রী বিনা বেতনে বিদ্যাভাস করিতেছে, মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য ফ্রি মোটরবাসেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশে মেয়েদের এরূপ আর কোন অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যালয়ের জন্য জমি-দান ছাড়া বেগম সাহেবা আরও একটি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য তিনি মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণা ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক কোন বালিকাকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। বৃত্তি-গ্রহণকারিণীকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

—০—

ভারতের শ্রেষ্ঠ নারী টেনিস-খেলোয়াড়

বোম্বায়ের মিস্ লীলা রাও ভারতের শ্রেষ্ঠ নারী টেনিস-খেলোয়াড়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বয়স যখন তাঁহার যৌবনের সীমায়ও উপনীত হয় নাই তখন ইনি নিখিল ভারত নারী টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া দেশবাসী সকেই চমৎকৃত করেন।

লীলা রাওয়ের জননীও টেনিস খেলায় অত্যন্ত নিপুণা। ইনি পশ্চিম ভারতের টেনিস প্রতিযোগিতায় একবার বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেন। মায়ের নিকটই লীলা রাওয়ের টেনিস খেলা শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়। লীলা রাও তখন পারিস শহরে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত লীলা টেনিস অভ্যাস করিতেন। তাঁহার জননী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে শিক্ষা দান করিতেন। সুতরাং প্রথম হইতেই ইনি নিপুণ খেলোয়াড়ের সহিত টেনিস ক্রীড়ায় অভ্যস্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন।

প্রথম প্রয়াসেই যে কুমারী লীলা রাও জয়যুক্ত হইয়াছেন তাহা নহে। প্রথম প্রথম তিনি অসংখ্য ভুল-ত্রুটি করিয়াছেন। অকৃতকার্য্যতা কিন্তু তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই, বরং তাঁহার উৎসাহই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়াছে। অধ্যবসায় এবং মনের বলেই তিনি টেনিস ক্রীড়ায় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

সারল্য এবং সত্যপ্রিয়তা কুমারী লীলা রাওয়ের আর একটী মহৎ গুণ। অনেকে আছেন, যাঁহারা অহমিকার জন্য নিজেদের দোষ-ত্রুটি আবৃত করিতে চেষ্টা করেন। লীলা রাও এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। প্রতিযোগীর কৃতিত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে অভ্যস্তা। আর এইরূপে যিনি পরের, বিপক্ষ প্রতিযোগীরও গুণাবলী ঘোষণা করিতে পারেন, তিনি যে জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই তরুণী টেনিস-বীর দেশ-বিদেশের বহু প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী আখ্যা লাভ করিয়া ক্রীড়াজগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

—:—

মোমতাজ জাহান শাহ্ নওয়াজ

কুমারী মোমতাজ জাহান শাহ্ নওয়াজ সুপ্রসিদ্ধ বেগম শাহ্ নওয়াজের কন্যা এবং জেডী মহম্মদ শফীর